১৯ মার্চ ১৯৮৬ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

আনন্দমেলা

B84.GLC.12.2316 Ben

৫ চৈত্র ১৩৯২ □ ১৯ মার্চ ১৯৮৬ □ ১১ বর্ষ ২৫ সংখ্যা

ধারাবাহিক উপন্যাস
ডোরাকাটা জামা । সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৯
গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৩২
বড়গল্প
ছোটমামার গোয়েন্দাগিরি । মীরা বালসুব্রমনিয়ন ৩৫
গল্প
অলৌকিক চশমা । অমিয়কুমার সরকার ১৩
হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ । ভগীরথ মিশ্র ১৭
মহারানির বুদ্ধি । বীণা মিশ্র ১৯
কট্‌কটির মাঠে । বিমান রাউত ২৪
সারমেয়-সমাচার । দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ৪৩
ভূতবিক্রয়-কেন্দ্র । স্বদেশরঞ্জন দত্ত ৫১
কে পাঠাল । অরুণ আইন ৫৫
কবিতা ও ছড়া
দোল এসেছে । সাধনা মুখোপাধ্যায় ১২
রঙ-বেরঙ । মৃণালকান্তি দাশ ১২
আজব কাণ্ড । কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় ৪২
অন্যায় । সুবন্ধু ভট্টাচার্য ৪২
ছোট্ট পাপু । করুণাময় বসু ৫৭
শার্লক হোমসের গল্প
হলদে মুখ । সার আর্থার কোনান ডয়েল ২৮
বিজ্ঞানবিচিত্রা
মানুষের যাত্রা শুরু । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৫
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ৬২
লেখাপড়া
হালত···শাখরচে···(অর্থ জানো) । দেব-সেনাপতি ৭
দুষ্টু মেয়ে (সহজে ইংরেজি) । প্রসাদ ৭
খেলাধুলো
হকিতে ভারতে ভারতই জিতল । সুজয় সোম ৬৩
জুনিয়র টেবল টেনিসে বাংলার সাফল্য । মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য ৬৫
ক্রিকেটারদের গল্প । সম্রাট রায় ৬৬
চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স
টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩১
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬১
অন্যান্য আকর্ষণ
আশ্চর্য ফল । সুজিতকুমার নাহা ২৭
তোমাদের পাতা ৪৯, ধাঁধা ৫৮, শব্দসন্ধান ৫৮
মজার খেলা ৫৯, হাসিখুশি ৫৯
ডাক্তারবাবু বলছেন । (ডাঃ) বিশ্বনাথ রায় ৬২

প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী

সম্পাদক : **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

তালমিছরির
জগতে
প্রবাদ পুরুষ
দুলাল চন্দ্র
ডড়ের
তালমিছরি

প্রস্তুত কারক:
শ্রী দুলাল চন্দ্র ডড়
২৮নং বনমালী সরকার স্ট্রীট,কলিকাতা-৫.ফোন:৩৩-৮২৮৪

ফ্যারেক্স® প্রথম পছন্দের!

কারণ, নতুন উন্নত ফ্যারেক্স-এ, বাচ্চাকে তার প্রথম ধাপের শক্ত-আহার ধরানোয় সাহায্য করার জন্যে থাকে, অত্যাবশ্যক সব উপাদানের সঠিক সম্মেলন।

প্রোটিন ও ফ্যাটের সঠিক মিশ্রণ

ফ্যারেক্স,প্রোটিনে ভরপুর হয়. যা বাচ্চাকে দৃঢ় ও সুস্থভাবে বাড়বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ফ্যারেক্স-এ থাকে, বাচ্চার কোমল হজম-ক্রিয়ার উপযুক্ত, বিশেষভাবে ফর্মুলেট করা একেবারে সঠিক পরিমাণে ফ্যাট।

বাচ্চার রক্ত সুস্থ রাখতে থাকে, যথেষ্ট পরিমাণে আয়রন

বাচ্চার ৪ মাসের সময়, তার মজুত রাখা সমস্ত আয়রন নিঃশেষ হয়ে যায়। ফ্যারেক্স-এ যথেষ্ট পরিমাণে আয়রন থাকে যা, বাচ্চার রক্ত সুস্থ রাখতে ও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

ক্যালসিয়াম-ফসফরাসের আদর্শ অনুপাত

বিশেষভাবে ফর্মুলেট করা ফ্যারেক্স-এ থাকে, ক্যালসিয়াম-ফসফরাসের ২:১ আদর্শ অনুপাত যা, দিনের পর দিন ধরে, বাচ্চার দাঁত ও হাড়, শক্ত ও সুস্থভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

আর, পুষ্টিকর এই ফ্যারেক্স-এর প্রতিটি আহার এখন আরো বেশী সুস্বাদু করা হয়েছে — আর, এটি মেশানোও অতি সহজ।

সস্নেহ উপহার এনেছে গ্র্যাক্সো!

নতুন উন্নত **ফ্যারেক্স®**

দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই!
এ শুধু জল দিয়ে মেশান, আর খাওয়ান।

CLARION/B/GX/10/244 BEN

মানুষের যাত্রা শুরু

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

উত্তর থেকে নেমে আসা বরফের ধাক্কায় বনজঙ্গল দক্ষিণে পেছোতে থাকে। যারা গাছে থাকে, ফলমূল খায়, অগত্যা তাদেরও দূর-হটা জঙ্গলের দিকে ছুটতে হল। মুশকিল হল, বানরের জাতভাই বনমানুষদের নিয়ে। গোরিলা আর শিম্পাঞ্জিরা মাটিতে থপ্‌থপ্‌ করে ঢিমেতালে চলে। বড়-বড় পালোয়ান জন্তুজানোয়ার তাদের তাড়া করে সহজেই ঘাড় মট্‌কাতে লাগল। বানর আর বনমানুষেরা সবাই ছিল গাছের সঙ্গে অদৃশ্য শেকলে বাঁধা।

প্রাইমেটদের একটা দল কিন্তু এই বন্ধন কাটাতে পেরেছিল। তারা গাছ ছেড়ে মাটিতে নেমে এসেছিল। মানুষ হল সেই প্রাণী। গাছ-ছাড়া এই নতুন স্বাধীনতা পেয়ে মানুষ হল এবার পৃথিবীর রাজা।

মানুষই একমাত্র প্রাণী, চারদিকের গণ্ডি দিয়ে যে বাঁধা নয়। মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে, নিজের খাবার নিজে জোটাতে পারে, আর পারে শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে।

মানুষের না আছে বাঘের মতো বড়-বড় থাবা, না আছে গণ্ডারের মতো বর্ম, না সাপের মতো বিষদাঁত। সিংহ বা হাতির পাশে মানুষকে মনে হবে তালপাতার সেপাই। তবু সে জলে স্থলে আকাশে ইচ্ছেমতো ভেসে ছুটে উড়ে যেতে পারে।

আদি-মানব (শিল্পীর কল্পনায়)

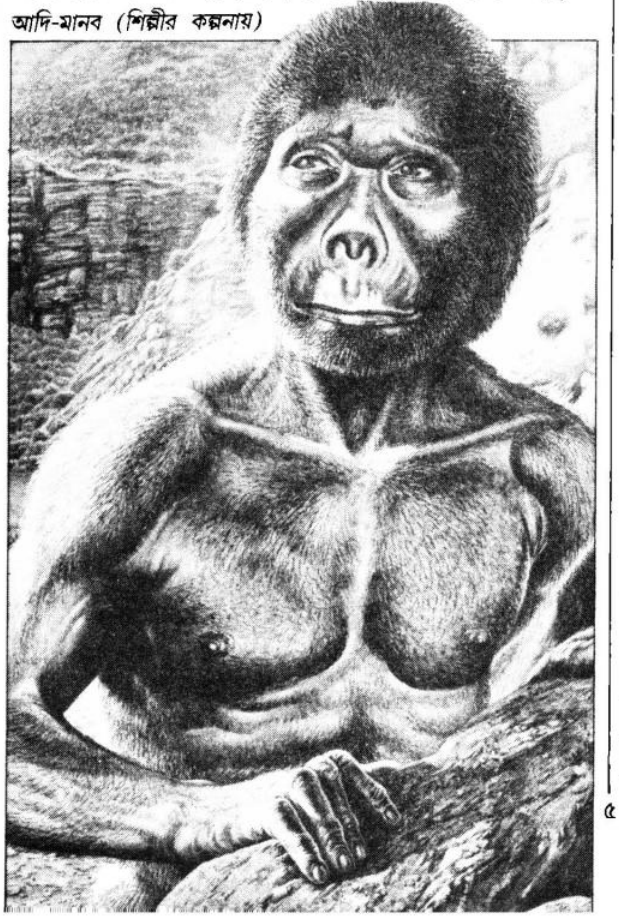

শিম্পাঞ্জি (মানুষ হতে পারেনি)

গরম আর ঠাণ্ডাকে হার মানাতে পারে। গায়ের জোরে কেউ তাকে কাবু করতে পারে না। রেলগাড়ি জাহাজ এরোপ্লেন জামাকাপড় ঘরবাড়ি বন্দুক, এইসব দিয়ে অন্যান্য জীবজানোয়ারের ওপর সে টেক্কা দেয়।

বলবান বাঘের ভরসা শুধু তার নিজের মাংসপেশি ; আর সবচেয়ে বুদ্ধিমান শিম্পাঞ্জির ভরসা কেবল তার নিজের হাত-পা। কিন্তু মানুষের হাতে থাকে বর্শা কি বন্দুক, চোখে থাকে দূরবীন বা অণুবীক্ষণ। হাতিয়ারের জোরেই মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে চলেছে।

মানুষের আছে দুটো বড় গুণ :
এক : মগজ রয়েছে ভাবনাচিন্তার ;
দুই : কাজ করবার হাত হাতিয়ার।

সবচেয়ে শাঁসালো মগজ হল মানুষের। এরই জোরে দেহের বাকি স্নায়ুযন্ত্রকে সামাল দিয়ে মানুষ নিখুঁতভাবে নড়াচড়া করতে পারে। পারে ভেবেচিন্তে তার কাজকর্মকে পরিচালিত করতে।

আর আছে হাত দিয়ে জিনিস তোলার অতুলনীয় ক্ষমতা। এটা সম্ভব হয়েছে এইজন্যেই যে, বুড়ো আঙুল দিয়ে স্বচ্ছন্দে সে তার হাতের অন্য সব আঙুলের মাথা ছুঁতে পারে। সাধে কি আর আমরা বুড়ো আঙুল দিয়ে অন্যদের লবডঙ্কা দেখাই !

মানুষ আসার আগে অব্দি সব প্রাণীকেই প্রকৃতির কাছে জোহুকুম হয়ে থাকতে হত। বিশেষ বিশেষ জায়গা ছেড়ে নড়তে পারত না ; তাদের বাঁচবার ধরনও ছিল পুরোপুরি ছাঁচে-ঢালা।

মানুষই একমাত্র জীব, যে নতমস্তকে হাত জোড় করে প্রকৃতির এই একচ্ছত্র প্রভুত্বকে মেনে নেয়নি। বরং সে তার চিন্তাক্ষম মস্তিষ্ক আর কর্মপটু হাত দিয়ে প্রকৃতিকে হার মানিয়ে নিজের মতো করে বাঁচতে পেরেছে। একমাত্র মানুষই পেরেছে তার চারপাশকে নিজের সুবিধেমতো বদলাতে।

সূর্য্যের রশ্মি যখন অনবরত আপনার ত্বকের রঙ ময়লা করতে থাকে, আপনি কি ফর্সা হতে পারেন?

আপনি জন্মেছিলেন এক বিশেষ রঙ নিয়ে। কিন্তু আজ তা অনেক পর্দা ময়লা হয়ে গেছে। আপনি জানেন — সূর্য্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি কত চট্ ক'রে রঙ ময়লা করে দিতে পারে। কিন্তু ওটাই রঙ ময়লা হওয়ার একমাত্র কারণ নয়। আপনার ত্বকের ভেতরে মেলানিন নামে এক রঞ্জক পদার্থ আছে, যা কিছু ত্বকে অন্যের তুলনায় অনেক বেশী ছড়িয়ে গড়ে — আর যত বেশী ছড়িয়ে পড়ে, ত্বক তত বেশী কালো দেখায়।

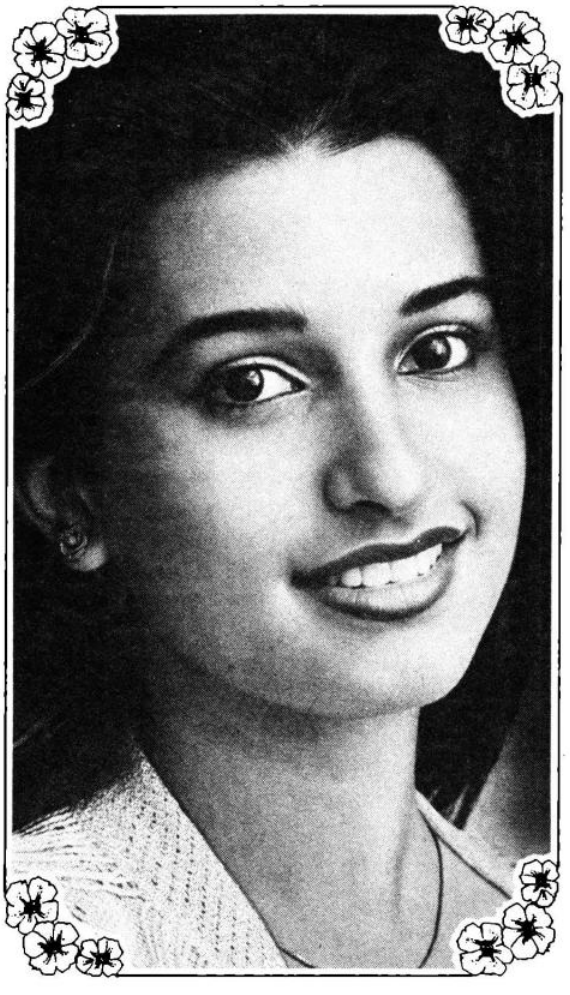

রঙ ফর্সা করার কি নতুন কোনো উপায় আছে?

হ্যাঁ আছে! এই প্রথম, বিজ্ঞানের এক নতুন আবিষ্কার — রঙ কালো করার প্রণালীকে নিয়ন্ত্রণ তো করেই, এমন কি তা বিপরীত দিকে চালনাও করে। ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী! এ হ'ল রঙ ফর্সা করার ক্রীম।

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী কিভাবে কাজ করে?

২ ভাবেঃ

ত্বকের ভেতরেঃ ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী রঙ কালো করার প্রণালীকে বিপরীত দিকে চালনা ক'রে, ত্বকের ভেতরে স্নিগ্ধ-কোমল আর নিরাপদভাবে কাজ ক'রে — আপনাকে এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে।

ত্বকের বাইরেঃ ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লীর বিশেষ 'রোদ এড়ানোর পর্দা' আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিকে আটকে রঙ ময়লা হওয়া নিবারণ করে, অথচ আপনি সূর্য্যের যাবতীয় স্বাস্থ্যকর গুণ গ্রহণ করতে পারেন।

ফর্সা হবার জন্যে মাত্র ৬-সপ্তাহের কোর্সঃ

৬-সপ্তাহ নিয়মিত দিনে দুবার ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী মাখুন। প্রথমবার মাখার পর ত্বক হয়তো একটু চিন্‌চিন্ করতে পারে। এর মানে ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী কাজ করছে, ছ'সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য সবার নজরে পড়বেই। নিয়মিত ব্যবহার করুন — আর ফর্সা হয়ে থাকুন।

ফর্সা হওয়া বা ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী সম্বন্ধে আরোকিছু জানতে হ'লে এঁর কাছে লিখুনঃ
ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী অ্যাডভাইজার,
পোঃ অঃ বক্স নং ৭৫৮,
বম্বে ৪০০ ০২১।

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী
রঙ ফর্সা করার ক্রীম

আপনাকে নজরে পড়ার মত ফর্সা করে...প্রকৃতির নিজস্ব কোমল উপায়ে!

হিন্দুস্থান লিভারের
একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS FALOV 37 2416 BG

অর্থ জানো

হালত… শাখরচে…

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' প্রকাশিত হয়, কলকাতার কথ্যভাষায় লেখা শহরের বাবুসমাজের এমন সরস ব্যঙ্গচিত্র বাংলা ভাষায় দুর্লভ। এই সুখপাঠ্য বইখানি তাই আজও জনপ্রিয়। ওই বই থেকে নেওয়া নীচের শব্দগুলির প্রত্যেকটির পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **খাতির নদারত**— (ক) যে খাতির করতে জানে, (খ) খাতিরের লোক, (গ) তোষামোদকারী, (ঘ) যে কাউকে খাতির করে চলে না।

২। **হালত**— (ক) দুর্ভাগ্য, (খ) দুঃসময়, (গ) অবস্থা, (ঘ) সংসার।

৩। **পরবস্তি**— (ক) দয়া বা করুণা, (খ) প্রতিপালন, (গ) পরের হয়ে কাজ করা, (ঘ) আশ্রয়।

৪। **হুনরে**— (ক) রাজমিস্ত্রি, (খ) চালাক, (গ) হস্তশিল্পে দক্ষ, (ঘ) ওস্তাদ।

৫। **শাখরচে**— (ক) খরচে নারাজ, (খ) বাজে খরচে, (গ) কৃপণ, (ঘ) বেশি খরচে।

উত্তর : ১। **খাতির নদারত**— (ঘ) যে কাউকে খাতির করে না। এটি আরবি শব্দ। যেমন, 'একত্রে বসেই চলছেন— খাতির নদারত।'

২। **হালত**— (গ) অবস্থা। মূলে আরবি শব্দ হালত। যেমন, 'কাঁদো কাঁদো মুখ করে বেকার ও কন্যাদায় হালতের পরিচয় দিচ্ছেন।'

৩। **পরবস্তি**— (খ) প্রতিপালন। মূলে ফারসি শব্দ পরবরিশ। যেমন, 'পুজোর সময় পরবস্তি হই যেন, বলেই তবল্‌জী ও শারীঙ্গেরা বড় রকমের সেলাম বাজালে।'

৪। **হুনরে**— (গ) হস্তশিল্পে দক্ষ। মূলে ফারসি শব্দ হুনরি। যেমন, 'কথায় বলে হুনরে চিন ও হুজ্জতে বাঙাল।' এর অর্থ চিনেরা হাতের কাজে ওস্তাদ আর বাঙালিরা কলহে ওস্তাদ।

৫। **শাখরচে**— (ঘ) বেশি খরচে। ফারসি শাহ বা শা শব্দের অর্থ বড়। যেমন, 'গুরুদাস বড় শাখরচে লোক।'

দেব-সেনাপতি

সহজে ইংরেজি

দুষ্টু মেয়ে

সেদিন ইস্কুল থেকে আসবার সময়ে বাড়ির কাছাকাছি এসে চম্বল দেখে, বড় রাস্তার মোড়ে তিন-চার বছরের একটি মেয়ে একলা দাঁড়িয়ে আছে। তার এপাশ-ওপাশ দিয়ে ট্রাম-বাস, লোক-জন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে যাওয়া-আসা করছে, আর সে একলাটি সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

"What's she doing here?" Chambal thought. "Where has she come from? Poor child, must have lost her way."

So he went up to her.

"Have you lost your way?" he asked.

"Yes," the child said simply, "I want to go home."

Chambal said, "Of course you do. Why did you come away from home, in the first place? Who did you come with?"

The child said, "I came alone."

"Now, what did you do that for?" Chambal asked. "You must be a very naughty girl."

"Yes," the child said. "I want to go home."

Chambal said, "But where is your home? Do you know your address?"

এর মধ্যে কিছু লোক জড় হয়ে গিয়েছে। নানারকম প্রশ্ন শুরু হয়েছে।

"Who's this girl? Is she lost? Who are her people? Who does she belong to?"

The child began to cry.

Just then a man came pushing his way through the crowd.

"Rekha!" he cried out. "You gave us such a fright. Come with me at once!"

লক্ষ করো :

Where does she come from ?
What did you do that for ?
Who did you come with ?
Who does she belong to ?

এই ধরনের বাক্য নিয়ে কিছু কথা, এবং প্রসঙ্গক্রমে আরও কিছু কথা, পরের বার বলব।

প্রসাদ

ঝাল ঝাল লঙ্কা আর টকমিষ্টি টমেটোর মিশ্রণ।

এবং তখন-ই দারুণ সব ঘটনা ঘটতে শুরু করে।

কিসানের নতুন টমেটো চিলি স্যস। এতে সব কিছুই আছে — মুখে জল আনার মতো ঝাল ঝাল স্বাদ যা আপনার রসনাকে তৃপ্তি দেবে আর এর সব-টুকুই আপনার চেটে-পুটে খেতে ইচ্ছে কর'বে।

একাধারে ঝাল ঝাল স্যসের স্বাদ

লালচে টমেটোর রসের সঙ্গে ঝাল ঝাল লঙ্কা মিশিয়ে তার ওপর খানিকটা গরম মশলা ছড়িয়ে দিন। কিসানের স্যস তৈরীর অনন্য অভিজ্ঞতা আর কারিগরী ক্ষমতা থাকায় এই অপূর্ব স্বাদ সারা পৃথিবীতে আর কোথাও পাবেন না।

প্রথম স্বাদেই একেবারে কাৎ

অরুচি দূর ক'রতে আপনার মুখ বদলান। আপনার মনের মতো সব খাবারগুলোতেই কিসানের নতুন টমেটো চিলি স্যস মিশিয়ে নিন। খেতে ব'সে দেখবেন এটি না হ'লে আপনার আর চ'লবেই না।

আর দ্বিধা ক'রবেন না। কিসানের নতুন টমেটো চিলি স্যস চেখে দেখুন! অন্য কোন স্যস আপনার পছন্দ মতো খাবারকে বা যে কোন খাবারকে এত সুস্বাদু এবং রুচিকর ক'রে তোলে না।

আজ থেকেইশুরু ক'রুন। এটি না হ'লে আপনার আর চ'লবেই না।

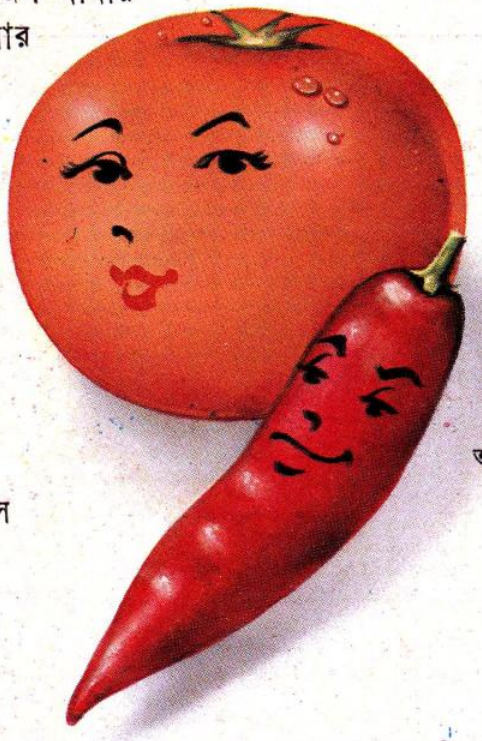

কিসানের নতুন টমেটো চিলি স্যসে.
এই স্যসের কোন বিকল্প নেই।

OBM 2004 Ben

শুরু হল সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস

ডোরাকাটা জামা

ডোরাকাটা বাঘ হয়। ডোরাকাটা ছেলে এই প্রথম দেখল রুকু। বাজারে হরেনদার স্টেশনারি দোকান। সেই দোকানে লজেন্স কিনতে গিয়ে রুকু দেখল হরেনদা নেই। তাঁর জায়গায় উদাস মুখে বসে আছে ফরসা-মতো, সুন্দর চেহারার, তার বয়সী একটা ছেলে। এক মাথা ঘন কালো কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল। টিকলো নাক। টানা-টানা চোখ। দেখার মতো ছেলে। সবচেয়ে দেখার মতো তার গায়ের জামা। এই মোটা নীল-নীল ডোরা-টানা হাফ শার্ট। যেন নীল একটা জেব্রা টুলে বসে আছে আপন মনে।

রুকু ছেলেটিকে দেখছে। ছেলেটি রুকুকে দেখছে। কারও মুখেই কোনও কথা নেই। শেষে রুকু বললে, "হরেনদা নেই!"

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বললে, "আজ্ঞে না।"

"তা হলে কে আছে?"

"আমি।"

"তা হলে জিজ্ঞেস করো।"

"কী জিজ্ঞেস করব?"

"জিজ্ঞেস করো আমার কী চাই।"

ছেলেটি পাখিপড়ার মতো বললে, "আমার কী চাই।"

রুকু হেসে ফেলল? হাসি চেপে বললে, "দূর বোকা। আমার কী চাই মানে, এই আমি, এই আমার কী চাই।"

সে ভয়ে ভয়ে বললে, "আপনার কী চাই।"

রুকু এবার হো-হো করে হেসে বললে, "তুমি ভীষণ বোকা। এভাবে দোকানদারি হয়!"

ছেলেটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রুকুর দিকে। চোখ দুটো ভিজে-ভিজে। যেন এই মাত্র কাঁদছিল।

রুকু জিজ্ঞেস করলে, "তোমার নাম কী?"

"নিতু।"

"হরেনদা তোমার কে হন?"

"মামা।"

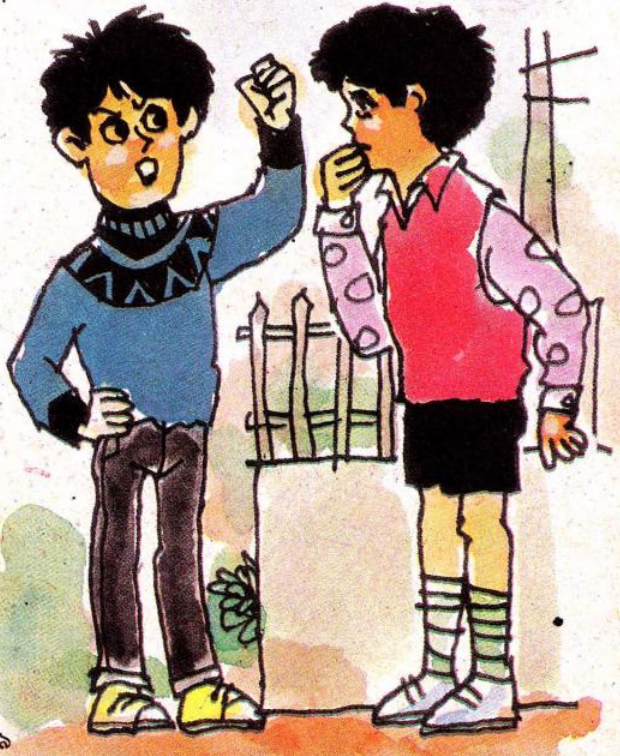

রুকু লজেন্স কিনে বাড়ি ফিরে এল। ফিরে এলে কী হবে, সারাদিনই নিতুর কথা, নিতুর চেহারা, নিতুর চোখ, আর নিতুর মোটা মোটা ডোরাকাটা নীল জামা চোখের সামনে ভাসতে লাগল। কী সুন্দর ছেলেটা!

দশটা লজেন্স কিনেছিল রুকু। সমান-সমান ভাগ। পাঁচটা সুকুর, পাঁচটা তার নিজের। সকাল থেকে সুকুটা যে কোথায় গেছে। তার টিকির দেখা নেই। দু'জনেরই স্কুলের পরীক্ষা হয়ে গেছে। তা বলে সকাল থেকে এইভাবে বেপাত্তা হয়ে যেতে হয়! সুকু তো এই রকম করে না। যাই করুক দাদাকে বলে করে। চার্চের মাঠে ক্রিকেট পড়েছে। সেইখানেই গেল নাকি! সে তো বড়দের খেলা। সুকু সেখানে গিয়েই বা করবে কী?

সুকুর ভাগের পাঁচটা লজেন্স নিয়ে রুকু ভারী বিপদে পড়েছে। নিজের পাঁচটা কখন শেষ হয়ে গেছে। কেবলই ইচ্ছে করছে একটা খায়। খেলেই বা কী! সুকু তো আর জানতে পারছে না। দশটার বদলে আটটা কিনলে সুকুর ভাগে চারটেই তো পড়ত। একটা প্রায় খেয়ে ফেলে ফেলে। মোড়কের প্যাঁচ প্রায় খুলেই ফেলেছিল। হঠাৎ মনে হল, না, খুব অন্যায় হবে। সমান সমান ভাগ। সেদিন সুকু তিনটে পেয়ারা কিনেছিল। প্রথমে একটা একটা দু'জনে খাবার পর, তৃতীয়টাকে সমান দু'ভাগ করে সুকুর হঠাৎ মনে হল, দাদার প্রথম পেয়ারাটা একটু ছোট ছিল, সঙ্গে-সঙ্গে আধখানাকে আবার দু'টুকরো করে এক টুকরো দাদাকে দিল। একা সুকুকে কেউ কিছু উপহার দিতে এলে নেয় না। বলে, 'হয় দুটো দাও, নয় তো দিও না।'

রুকু বেরিয়ে পড়ল। বাড়িতে থাকলেই মন দুর্বল হয়ে পড়ছে। খাই-খাই ভাব হচ্ছে। সুকুর খোঁজ করা যাক। কোথায় যেতে পারে। ডাকঘরের কাছে সুবোধের সঙ্গে দেখা। রুকু কিছু বলার আগেই, সুবোধ বললে, "আমি তোদের বাড়িতেই যাচ্ছি। সুকু মারামারি করেছে।"

"সে কী রে!"

"হ্যাঁ, সাঙ্ঘাতিক মারামারি। অনিলের নাক ফাটিয়ে দিয়েছে।"

"কোথায় সে?"

"স্টেশানের ডান প্ল্যাটফর্মে চুপ করে বসে আছে।"

"খুব লেগেছে?"

"দেখতে গেলুম, দেখতে দিলে না।"

রুকু জোরে জোরে পা ফেলে স্টেশানের দিকে ছুটল।

ডাউন ট্রেন পাস করে গেছে সবে। ডিসট্যান্ট সিগনালে গার্ডের কেবিন তখনও দেখা যাচ্ছে। প্ল্যাটফর্মে বেশ ভিড়। অনেক প্যাসেঞ্জার নেমেছে। শীতে এদিকে অনেকেই বেড়াতে আসেন। বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গা। চারপাশে ছোট-বড় পাহাড়। মাঝে শহর। ছোট পাহাড়ি নদী এঁকেবেঁকে চলে গেছে খেলে-খেলে। বনজঙ্গলও আছে। এক সময় বাঘ ছিল। রাতের বেলায় পাহাড়ের মাথায় ঘাসে দেহাতিরা আগুন ধরিয়ে দেয়। তখন বড় সুন্দর দেখায়। মনে হয়, শহর ঘিরে আলোর রেখা কেঁপে-কেঁপে নাচছে। ঘাসের ছাইতে খুব ক্ষার থাকে। দেহাতিরা সেই ছাই দিয়ে কাপড় কাচে।

দেখতে দেখতে ভিড় পাতলা হয়ে এল। প্ল্যাটফর্ম প্রায় ফাঁকা, কিন্তু সুকু কোথায়। সব বেন্চ খালি পড়ে আছে। একটা-দুটো করে গাছের পাতা খসে-খসে পড়ছে। রুকু এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, এমন সময় ওভারব্রিজের ওপর থেকে সুকু ডাকল, "দাদা, এই দাদা।"

"হেই। তুই ওখানে কী করছিস?"

সুকু পা ঝুলিয়ে বসে আছে। ওভারব্রিজে বসে থাকতে রুকুর ভীষণ ভয় করে। মনে হয় এক্ষুনি বুঝি গলে লাইনের ওপর পড়ে যাবে। আর নীচে দিয়ে ট্রেন গেলে তো কথাই নেই। তখন মনে হয়, উলটে না ফেলে দেয়।

রুকু বললে, "নেমে আয়।"

সুকু বললে, "তুই উঠে আয়।"

শেষে সুকুই নেমে এল। রুকু খুব মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাইকে দেখছে। মারামারির কোনও চিহ্ন খুঁজে পেল না। কাটা, ছেঁড়া, থেঁতলানো, জামা ছেঁড়া। কোনও চিহ্নই নেই। ঝলমলে চেহারা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুকু। জ্বলজ্বলে চোখ। হাসি-হাসি মুখ। অথচ যার সঙ্গে মারামারি করেছে, সেই অনিল একটা বেশ বড়সড় ডাকাত টাইপের ছেলে। মহা পাজি।

রুকু সুকুর কাঁধে হাত রেখে বললে, "কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস?"

"অনেকক্ষণ।"

"বাড়ি যাবি না?"

"না।"

"কেন না?"

"আমার মন খারাপ।"

"তুই মারামারি করেছিস?"

"করেছি।"

"কেন করেছিস?"

"দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার ঠেকাতে।"

"কে দুর্বল, কে সবল?"

কথা বলতে বলতে দু'জনে সিমেন্ট বাঁধানো বেন্চে বসল। এদিকে এখন আর অনেকক্ষণ ট্রেন আসবে না। বিশাল একটা মালগাড়ি আপন মনে ধিকিধিকি করে চলেছে তো চলেছেই। মাঝে-মাঝে ঘটাং-ঘটাং করে আওয়াজ হচ্ছে। বগিতে বগিতে টান ধরে। পশ্চিম আকাশে সাতপুরা পাহাড়ের ঢেউ-এর ওপর হাল্কা কুয়াশা জমতে শুরু করেছে। রোদ যত পড়ে আসছে, শীতও তত বাড়ছে। আজ আবার স্কুলের মাঠে ব্যায়াম-প্রদর্শনী আছে। কলকাতা থেকে কমল ভৌমিক এসেছেন দলবল নিয়ে। ব্যাণ্ড বাজছে তালে তালে। মা বলেছেন, 'যাব'। বাবার দুপুরে একটা বড় অপারেশান করার কথা। সেটা সেরেই তাড়াতাড়ি চলে আসবেন। আজ আর অন্য কোনও রুগি নেবেন না। বাবাকে আবার অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে হবে। বিষয়, 'ব্যায়াম ও স্বাস্থ্য'।

রুকু বললে, "একটু পরেই স্কুলের মাঠে ব্যায়াম-প্রদর্শনী শুরু হবে। বাবা এতক্ষণে বোধহয় বাড়ি ফিরে এসেছেন। এক্ষুনি না গেলে কী হবে জানিস?"

"আমার একটা কাজ এখনও বাকি আছে," সুকু গম্ভীর মুখে বললে।

"কী কাজ?"

"অনিলের নাক ফাটিয়েছি। পলাশের মাথা ফাটাব।"

সুকুর কথা শুনে রুকুর বুক কেঁপে উঠল। পলাশ! এই

শহরের সব চেয়ে ওঁচা ছেলে। স্কুলের একই ক্লাসে পড়ে আছে পরপর চার বছর। এবার পাশ করতে না পারলে, হেডমাস্টারমশাই বলেছেন নাম কেটে দেবেন। রোজ সিনেমা দ্যাখে। বাজারে চিতুর দোকানে বসে চা খায়, আড্ডা মারে। বিকেলে এই স্টেশানে এসে আর তিনটে ছেলের সঙ্গে তাস পেটে।

ভাইয়ের হাত ধরে রুকু বললে, "তুই কিন্তু ক্রমশই খারাপ দিকে চলে যাচ্ছিস। মারামারি কারা করে জানিস ?"

"কারা করে ?"

"যারা বোকা।"

"তুই কিছুই জানিস না দাদা। মারামারি কারা করে জানিস ! যাদের সাহস আছে।"

"পলাশ তোর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। এই কেঁদো চেহারা।"

"চেহারা কী করবে দাদা। চেহারায় কী হয় ! অনিল আমার চেয়ে অনেক বড়। এক ঘুসিতে নাক থেবড়ে দিয়েছি। আমি ফাদার পেরিয়ারের কাছে বকসিং শিখি রে দাদা।"

"বকসিং শিখিস বলে যাকে-তাকে ধরে ধরে মারবি !"

"যাকে-তাকে তো মারি না। যারা অন্যায় করে তাদেরই মারি।"

"ওরা কী অন্যায় করেছে ?"

"শুনবি তা হলে।"

শোনা আর হল না। রুকু আর সুকুর বাবা, ডক্টর প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্ল্যাটফর্মে এসে, ধীরে-ধীরে এগিয়ে এলেন দু'জনের সামনে। সায়েবদের মতো চেহারা। প্রায় ছ'ফুট লম্বা। ফর্সা টকটকে রঙ। দেখলে মনে হবে খুব গম্ভীর মানুষ। একটা রাগী-রাগী ভাব। কিন্তু মোটেই তা নয়। ভীষণ ভাল মানুষ। সারা শহরের মানুষ তাঁকে চেনে। নাম শুনলে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে।

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "চোখের সামনে একটা ঘড়ি ঝুলছে, তোমরা দেখেছ ? ওদিকে একবারও চোখ গেছে ?"

রুকু বললে, "আমি সুকুকে ডাকতে এসেছি।"

"আর আমি এসেছি তোমাদের ডাকতে। ক'টা বেজেছে দেখেছ ?"

"তুমি কেন এলে বাবা ? আমরা তো যাচ্ছিলুম।"

ডক্টর মুখার্জি গম্ভীর গলায় ডাকলেন, "সুকু।"

ডাক শুনেই সুকু বুঝতে পারলে, বাবা তাকে বকবেন। সুকু সঙ্গে-সঙ্গে বুক চিতিয়ে বললে, "আমি কোনও অন্যায় করিনি বাবা।"

"নিজের বিচার নিজে করা যায় না সুকু।"

রুকু বললে, "তুমি কী করে জানলে বাবা !"

"অনিলের বাবা অনিলকে নিয়ে হসপিটালে এসেছিলেন। অনিলের নাকের ব্রিজ ভেঙে দুটুকরো করে দিয়েছে। এই বয়েসে এই যদি ঘুসির জোর হয়, বড় হলে এ ছেলে তো ব্রুসলি হবে। আমি এখানে তোমার বিচার করতে চাই না। সব কিছুরই একটা ডেকোরাম আছে।"

সুকু বেশ জোর গলায় বললে, "তোমার ছেলে অন্যায় করতে পারে না।"

"আর ইউ শিওর ?"

"ডেড্ শিওর।"

"ডেড্ শিওর," ডক্টর মুখার্জি হেসে উঠলেন, "তুই হঠাৎ মারলি কেন ?"

"এখানেই শুনতে চাও, না বাড়ি গিয়ে শুনবে ?"

"না, এখানে নয়, এখন নয়। এক্ষুনি স্কুলে যেতে হবে। আর সময় নেই।"

স্টেশানের বাইরে ডাক্তারবাবুর চকোলেট রঙের বিলিতি গাড়ি দাঁড়িয়ে। সাদা রঙের উর্দি-পরা ড্রাইভার। উত্তর প্রদেশের মানুষ। এক সময় নাকি ডাকাতি করত। রাজস্থানে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলাপ। পায়ে গুলি লেগেছিল। ডক্টর মুখার্জি সেই সময় এক মিশনারি হাসপাতালের চিফ সার্জেন। ইচ্ছে করলে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারতেন। তা করেননি। নিজের দায়িত্বে নিজের বাংলোয় লুকিয়ে রেখে, মনোহরকে ভাল করে তুলেছিলেন। একটি মাত্র কারণে। মনোহর বলেছিল, 'ডাক্তার সাব, কাল রাতে আমার মেয়েটা ট্রেনে কাটা পড়ে মরেছে। আমার বউ পাগল হয়ে গেছে। কেবল বলছে, মেয়ে মরেছে তোমার পাপে। আমি ভাল হতে চাই। আমার বউকে ভাল করতে চাই।' সেই মনোহর এখন নাম পালটে বিশ্বনাথ দাস। পুরো বাঙালি ? শুধু বাঙালি নয়, ধার্মিক, সাধক। ডক্টর মুখার্জির বাংলোর আউট হাউসে থাকে। গাড়ি চালায়। বাগান দ্যাখে। ফুল ফোটায়। ফল ফলায়। রুকুদের বিশুদা। লোকটির কেউ আর বেঁচে নেই। সাতটা কুকুর আর দশ-বিশটা বেড়াল নিয়ে বেশ আছে। যা মাইনে পায় সবটাই খরচ করে অন্যের জন্যে। ভাল গান গায়। সুন্দর ছবি আঁকে। রোজ সকালে আড়াইশো ডন, আর পাঁচশো বৈঠক মারে।

গাড়ি ছুটল বাংলোর দিকে। আজ খুব শীত পড়েছে। এখনই চারপাশ শীতে যেন নিথর হয়ে আসছে। দূর আকাশে পাহাড়ের সারি যেন জমাট অন্ধকার। আকাশ আটকে ধ্যানে বসে গেছে। (ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

দোল আসছে

সাধনা মুখোপাধ্যায়

দোলের আবির মেখেই নাকি
পলাশ হল লাল
দোল আসছে তাই তো শিমুল
সাজছে চিরকাল ।
আয় না রে আজ রঙিন হয়ে
আমরা হোলি খেলি,
খুশির নিশান উড়িয়ে যেন
বলছে বোগেনভেলি ।

এসব দেখেই তোতন বোতন
ঘুচাই এবং টুকু,
এ-ওর মুখে মাখিয়ে দিল
সবুজ আবিরটুকু,
ফুল-পাতারা যদি খেলে
এমন হোলিখেলা
কালোর ছিটে পড়বে কেন
শুধুই তাদের বেলা !

হলুদ-মেরুন-লাল-সবুজে
আজকে মেশামেশি
ছোট বড় সবাই তো আজ
ভুলছে রেষারেষি,
থালার মতো চাঁদ উঠেছে
সবুজ রঙের টিয়ে
দোল খেলি আয়, দোল খেলি আয়
সবুজ আবির দিয়ে ।

রঙ-রঙ্গ

মৃণালকান্তি দাশ

আবির খেলবি আমার সঙ্গে
রঙ দিবি আজ প্যান্টে জামায় ?
এখন কী আর রঙ খেলা হয় !
ছিলাম যখন ওকলাহামায়—
জাপান থেকে গ্যালন গ্যালন
রঙ আসত টিউব রেলে,
আমাজনের জলে সে-রঙ
হপ্তা-তিনেক রাখত ফেলে ।
দোলের দিনে পিচকিরি সব
রঙিন জলে নিতাম ভরে,
হাতের কাছে পেতাম যাকে
রঙ মাখাতাম আচ্ছা করে ।

এই তো বছর পাঁচেক আগে
বন্যা হল ভীষণ রকম—
প্রাণ হারাল তেষট্টিজন,
পাক্কা দুটি হাজার জখম ।
আসলে কী ব্যাপার জানিস,
অত রঙিন জলের ঠেলা
বান ডাকিয়ে ছাড়ল শেষে—
সেই থেকে তো বন্ধ খেলা ।
এখন যাব বন্ধু-বাড়ি,
মাঞ্জা-দেওয়া জামা-কাপড় ।
রঙটি যদি লাগাও বাপু
বলছি খাবে দু-চার চাপড় ।
অ্যাইও পাজি, হতচ্ছাড়া,
ইঁদুর, ছুঁচো, বেআক্কেলে—
রঙিন জলের গামলাখানা
মাথায় আমার উলটে দিলে !
এমনি করে ঢালিস যদি
রঙের গামলা সবার মাথায়—
ওকলাহামায় ঘটেছে যা,
ঘটবে শেষে কইলকাতায় ।

ছবি : দেবাশিস দেব

উঁহু, একদম চশমা খোলা চলবে না ···

অলৌকিক চশমা

অমিয়কুমার সরকার

হজমি গুলি চুরির দায়ে ছোট্‌কার কাছে কানমলা খেয়েও ছোট্টুর শিক্ষা হয়নি। শিশিটা ছোট্‌কা আজ আলমারির কোণে, কাল টেবিলের ড্রয়ারে, পরশু উঁচু তাকে লুকিয়ে রাখেন। ছোট্টু কিন্তু ঠিক খুঁজে খুঁজে বের করবে, আর প্রতিদিন গুনে গুনে চারটে বড়ি শিশি থেকে কমিয়ে দেবে। ছোট্‌কার অবশ্য গোনা থাকে না, শিশিটার নড়চড় দেখে টের পেয়ে যান ; আর তাঁর কেমন যেন মনে হয়, শিশিটা থেকে ছোট্টুই ঠিক সরিয়েছে।

ছোট্‌কা সকলের সামনে সেদিন খাবার টেবিলে, ছোট্টুর মা যখন পরিবেশন করছিলেন, সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে চিৎকার করে বললেন, "জানো রাঙা-বউদি, হজমি গুলির শিশি থেকে রোজ চুরি যাচ্ছে, আর চোর সকলের সামনেই বহাল তবিয়তে !"

মা কথাটায় কান দিলেন না।

ছোট্টু কিন্তু শোনামাত্র কেমন হয়ে গেল। দিদি, ছোটমামা, ছোটপিসি, সকলের জোড়া-জোড়া চোখ যেন ওর দিকে তাকিয়ে, ব্যাপারটা ও না তাকিয়েও বুঝতে পারছে।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয় ! ছোট্‌কা আর সময় পেলেন না, সকলের সামনে এমন করে ওকে অপদস্থ করা ! উৎসবের বাড়িতে দাদু-দিদা, বড়মামা-মাসি,

ছোটপিসি-পিসেমশাই, সব্বাই এসে গেছেন, কথাটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়তে কতক্ষণ ? ছি-ছি, বেচারি সকলের সামনে মুখ দেখাবে কেমন করে ?

মা বললেন, "কী রে ছোট্টু, অমন হাঁ করে কী ভাবছিস্ আর আড়-চোখে তাকাচ্ছিস ? পাতের খাবার দেখছি তোর যেমনটি ছিল তেমনি পড়ে আছে !"

ছোট্টু ভাবল, দিদিও তো হামেশাই খাবার ছেড়ে গল্পের বই নিয়ে মশগুল থাকে, তবুও মা ঠিক ওকেই ধরলেন ! মুখ ঘোরাতেই দেখল, ছোট্কা হাটে হাঁড়ি ফাটিয়ে দিব্যি পাকা গোয়েন্দার মতো মুচকি মুচকি হাসছেন। আর দিদি ? যা ভেবেছে তাই, পাতের খাবার যেমন, তেমনি পড়ে, চোখ দুটো শুধু গল্পের বই গিলছে।

বাঁচতে হলে ছোট্কার আলোচনার বিষয়বস্তু এই মুহূর্তে পালটানো দরকার, ছোট্টু তাই মরিয়া হয়ে বলে উঠল, "দিদিও কিছু মুখে তোলেনি মা, গল্পের বইয়ে ডুবে গেছে।"

কথাটা দিদির কানে যেতেই গল্পের বই থেকে চোখ দুটো ছিটকে সরে এল, "দ্যাখ ছোট্টু, পাকামি করবি না, গল্পের বই পড়ি আমি, বেশ করি, তাতে তোর কী ?"

ছোটমামার পাতে কী যেন দিতে-দিতে মা হঠাৎ থেমে গিয়ে বলে উঠলেন, "নে, আবার দুটোতে লাগল, খাবার সময়েও তোদের ঝগড়া আর চুলোচুলি, আর পারি না বাপু ! নে, তোরা ঝগড়া কর, আর-সকলের খেয়ে কাজ নেই।" মা একরকম রাগ করে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

ছোট্টু দেখল, অবস্থা বেগতিক, তাড়াতাড়ি নাকেমুখে গুঁজে প্লেট পরিষ্কার করে সাফ করে দিল, মা আসার আগেই।

ছোট্কার প্রিয় মাছের কালিয়া নিয়ে মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ছোট্কার দিক থেকেই শুরু করলেন।

"রাঙাবউদি, পেট ভরে গেছে, আর নয় !"

"সে কী ঠাকুরপো, তুমি না বললে কবজি ডুবিয়ে খাবে, দুটো মাছ তোমায় নিতেই হবে।"

ছোট্টু মনে-মনে হাসল, যাক্, ফাঁড়াটা বোধহয় এ যাত্রায় কেটে গেল। আর ছোট্কা ? দুটো কেন, চারটে মাছ, চাট্নি, চমচম আর দই সমানে ওড়াবেন, তবুও 'না, না' করছেন।

ছোট্কার পাতে মা বিনাবাধায় চার-চারটে মাছ চাপিয়ে হাসতে হাসতে ছোটপিসির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, "দ্যাখো ঠাকুরপো, বয়স হচ্ছে, এখন আর পারি না ! বারবার দিতে কষ্ট হয়, তাই একবারে দিয়ে গেলাম। চেটেপুটে খাবে, একেবারে পাত পরিষ্কার করে।"

ছোট্টু মনে-মনে আর-একবার হাসল, তা আর বলতে !

ছোট্টুর পাতের দিকে চোখ পড়তেই মা আঁতকে উঠলেন, "কী রে, রাক্ষস নাকি ! নিমেষে পাতখানা শেষ করলি ?"

ছোট্কার মুখ-ভর্তি খাবার, তাও কিন্তু বলা চাই, "ছোট্টুর আজকাল একটু-আধটু রাক্ষুসে খিদে হবে বইকী !"

ভাগ্যিস ছোটকার মুখটা জোড়া, কথাগুলো পরিষ্কার শোনা গেলে আর রক্ষে থাকত নাকি ?

সেদিনের মতো খুব বাঁচা বেঁচে গেল।

॥ ২ ॥

বেশ ক'দিন ধরেই ব্যাপারটা ছোট্টু লক্ষ করছে। চোখে সে বেশ ঝাপসা দ্যাখে ! আজকে অঙ্কের স্যার খামোকা তার কান মলে দিলেন। পিছনের বেঞ্চিতে বসে অঙ্কটা ও না-হয় একটু টুকতে ভুল করেছে, তাই উত্তরটাও ভুল ! কিন্তু সেই ভুল সংখ্যাটাকে ঠিক ধরলে, তার কষা সরলটা মোটেই ভুল নয়।

বাড়ি ফিরে ছোট্কা সবকিছু শুনে বললেন, "ছোট্টুটা মাস্টারদের হাতে পড়ে-পড়ে কানমলা খাচ্ছে, এটা ঠিক নয়, চল, কালকেই তোর চোখ দেখিয়ে একটা ব্যবস্থা করব।"

এই দশ বছর বয়সেই ছোট্টুর চোখের পাওয়ার বেশ বেড়ে গেছে। চোখের ডাক্তারবাবু বললেন, "মোটেই দেরি করবেন না, চশমাটা যত তাড়াতাড়ি পারেন, করিয়ে দেবেন। দেরি করলে চোখের ক্ষতি হতে পারে।"

বাড়িতে ঢুকেই ছোট্কা তো চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করলেন। "রাঙা-বউদি, এ-বাড়িতে কারও চোখে আজ পর্যন্ত চশমা উঠল না, আর এই পুঁচকে ছেলে, এতটুকুন বয়স থেকে চোখে চশমা ! কালে-কালে কত দেখব !"

বাবা সব শুনে গম্ভীর মুখে বললেন, "চশমা ছাড়া যখন উপায় নেই, নেপালের দোকান থেকে চশমাটা করিয়ে নিস। বেচারি কবে বলে গেছে, কারও চশমার দরকার হলে ওর দোকান থেকে যেন করিয়ে দিই। ছোট্কাকে নিয়ে ছোট্টু তুই কালই চলে যাস, আমি বলে দেব'খন।"

দিদি বাটিতে মুড়ি চিবোচ্ছিল, সুযোগ পেয়ে সেও ফোড়ন কাটল, "কী রে ছোট্টু, শুনলাম, তোর নাকি চশমা হচ্ছে ? চিনতে পারবি তো আমাদের ?"

যতই শোনে, ছোট্টুর কেমন লাগে ! চশমা-চোখে তাকে নিশ্চয়ই পাকা-পাকা লাগবে, রাতারাতি গম্ভীর-মুখো এক বুড়োখোকা বনে যাবে সে। চশমাটা কি না নিলেই নয় !

নেপালকাকু ছোট্টুর বাবার ছেলেবেলার বন্ধু। সেই কবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গিয়ে, নেপালের হিমালয়ে-হিমালয়ে সাধু-সন্ন্যাসীদের পিছনে পিছনে ঘুরেছেন। তাঁর অন্য কী একটা নাম ছিল। জীবনের বেশির ভাগ সময় নেপালে কাটিয়েছেন বলে, বাবা ঠাট্টা করে ওঁকে 'নেপাল' বলে ডাকেন। সেইসূত্রে ছোট্টুরও নেপালকাকু, বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ সশরীরে একদিন হাজির হয়েছিলেন ওদের বৈঠকখানায়।

বউবাজারে নেপালকাকুর চশমার দোকানে বসে-বসে, ছোট্টবেলার সেই কথাগুলো আবার নতুন করে ছোট্টুর মনে পড়ল।

অন্ধকার ঘরে চেয়ারে বসে সে স্পষ্ট শুনতে পেল, ছোট্কাকে নেপালকাকু বলছেন, "ভূপতির এই কচি-ছেলের চোখে চশমা ! কুছ্ পরোয়া নেই, আমার হাতযশ দেখে নিস, এই চশমাই ওকে নতুন মানুষ করে তুলবে, নতুন পথ দেখাবে।"

টুকিটাকি পরীক্ষা শেষ হবার পর ছোট্টু দেখতে পেল, তার চশমাটা অন্ধকার ঘরের কালীমূর্তির সামনে রেখে নেপালকাকু বিড়বিড় করে কীসব মন্ত্র আউড়ে গেলেন। তারপর চশমাটা চোখে পরিয়ে, চক্ষু-পরীক্ষার কাঁচের অক্ষরের বাক্সটির আলো জ্বালিয়ে বললেন, "ছোট্টুবাবু, দ্যাখো তো কেমন লাগে।"

ছোট্টুর তো মাথা ঘুরে গেল ! অক্ষরগুলো যেমন ঝকঝকে তকতকে, তেমনি নিখুঁত সুন্দর। কিন্তু এ কী ! সে যেন অন্য জগতের মানুষ। সবকিছু দেখবার, বলবার শক্তি আপনা থেকে পেয়ে যাচ্ছে।

ঢোক গিলে ছোট্টু বলল, "নেপালকাকু, সবকিছু ঠিক আছে, এই চশমাটাই আমি নেব।"

ঘরের আলোটা জ্বালতেই, পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছোট্কা বললেন, "নেপালদা, কত দিতে হবে ?"

নেপালকাকু জিভ কামড়ে বললেন, "ছি, ছি ! ভূপতির ছেলের চশমার দাম ! সে আমি মরে গেলেও নিতে পারব না। ওটা আমার ছোট্টুবাবুকে উপহার।" বলে ছোট্টুর দিকে চেয়ে একটু হাসলেন।

॥ ৩ ॥

পরদিন সকালে চশমাটা পরতেই গা'টা কেমন ছমছম আর শিরশির করে উঠল ছোট্টুর। সবকিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে, আর ভেতর থেকে কে যেন সব দেখে-দেখে তাকে বলে দিচ্ছে। একেই কি ভর-হওয়া বলে ? চশমাটা খুলতেই আবার সেই আগের মতো। ব্যাপার দেখে আবার চশমাটা পরতে সাহস পাচ্ছে না সে।

মা তাকে দেখে বললেন, "উঁহু, একদম চশমা খোলা চলবে না, ছোট্টু, পরে নাও এক্ষুনি !"

ছোট্কা অফিস যাচ্ছিলেন, থমকে দাঁড়িয়ে এক ঝুড়ি উপদেশ দিলেন, "ছোট্টু, চশমাটা শখের সাজ নয়, চোখ ভাল করতে তোমায় সর্বক্ষণ পরতে হবে, মনে রেখো।"

সাহস করে চশমাজোড়া নাকের ডগায় চাপিয়েই দিদির খোঁজে ছুটল ছোট্টু। দিদির স্কুলে আজ ইতিহাস পরীক্ষা, দুলে-দুলে ও টিপু সুলতানের অধ্যায় একমনে পড়ে চলেছে। চশমা-চোখে ছোট্টুকে ভেতর থেকে কে যেন বলে দিল, "দিদিকে বলে দে, টিপু সুলতান নয়, বাবরটা ভাল করে দেখে নিতে !"

বিজ্ঞের মতো ছোট্টুও বলে দিল, "এই দিদি, তোদের ইতিহাস পরীক্ষায় বাবর থেকে প্রশ্ন দেবে, টিপু-সুলতান পড়ে সময় নষ্ট করছিস কেন ?"

পরীক্ষার সময় সকলেই অসহায় ! ছোট্টুর কথাটা ও অক্ষরে-অক্ষরে মেনে নিয়ে নিমেষে পাতা উলটে 'বাবর'-এ এসে ঝটপট চোখ বুলিয়ে নিতে লাগল।

চশমা চোখে দিলেই ছোট্টুর একটা পরিবর্তন ঘটে যায়, স্কুলে গিয়ে সেদিন সেটা আরও পরিষ্কার হয়ে গেল।

অঙ্কের মাস্টারমশাই আজকে যে অঙ্কটি কষতে ঘেমে-নেয়ে উঠলেন, অনায়াসে ছোট্টু তা ব্ল্যাকবোর্ডে সকলের সামনে চশমা-চোখে ঝটপট কষে দিল। যে মাস্টারমশাই অঙ্ক-ভুলের অজুহাতে তার কান মলে দিয়েছিলেন, তিনিই আজকে ছোট্টুকে নিয়ে ছেলেদের সামনে গর্ব করলেন।

যে বিস্ময়টি বাড়িতে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল, তাতে সে অবাক না হয়ে পারল না। পরীক্ষা দিয়ে দিদি লাফাতে লাফাতে স্কুল থেকে ফিরে, বইয়ের ব্যাগ নামিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "ছোট্টু, তুই একটা জিনিয়াস্ ! ভাগ্যিস্ বলেছিলি, এই দ্যাখ্, বাবর থেকেই তিনটে প্রশ্ন এসেছে। তোকে কী বলে যে আশীর্বাদ করব।"

"থাক, আশীর্বাদে আর কাজ নেই ! মাঞ্জা সুতো আর ঘুড়ি কিনে দিবি সামনের বিশ্বকর্মা-পুজোতে।"

দিদি বলল, "তথাস্তু।"

॥ ৪ ॥

পড়ার টেবিলে বসে ছোট্কার শিশি থেকে ম্যানেজ-করা হজমি গুলি সকলের নজর এড়িয়ে গালে ফেলতেই বিষম লেগে গেল ছোট্টুর। সবে একটু সামলাতেই ছোট্কা তাকে নিয়ে পড়লেন। "খুব যে ভবিতব্যের কাসি কাসা হচ্ছে ! রাতারাতি চশমা নিয়ে ছোট্টুবাবু তো একদম পালটে গেলেন, ব্যাপারটা কী ?"

নিমেষে ভিজে-বেড়ালটি সেজে গেল ছোট্টু। ইতিমধ্যে ছোট্কার অফিসের এক সহকর্মী দেখা করতে এসেছেন। ক্যাশের ব্যাপারে কী একটা গণ্ডগোলে বিপদে পড়েছেন

ভদ্রলোক ! চাকরি রাখাই দায়। ছোট্কার সাহায্য চান।

চশমা-চোখে এক নজর দেখতেই, ছোট্টুর ভিতর থেকে কে যেন বলে দিল, "লোকটি বিশেষ সুবিধের নয়।" ছোট্টুও যথারীতি আড়ালে ডেকে সাবধান করে দিল ছোট্কাকে।

পরদিন ছোট্কা অফিস থেকে ফিরেই ছোট্টুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ছোট্টুবাবু আমাকে খুব বাঁচিয়ে দিয়েছ। সান্যালের খামোকা অনেকগুলো টাকা জলে গেল, আমারও যেত, সাবধান না করিয়ে দিলে। এখন থেকে ছোট্টুবাবু তো আমার ফ্রেণ্ড, ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড।"

ছোট্টুর দিকে কেমন যেন হাঁ-করে চেয়ে থাকলেন ছোটকা। বোধহয় ভবিষ্যৎ বলার বিস্ময়কর প্রতিভার কারণটা তিনি ছোট্টুর মধ্যে খুঁজে দেখছিলেন।

ক'দিন হল ছোট্টুর মা'র গুরুদেব এসেছেন। তিনি তান্ত্রিক, শব-সাধনা করতেন। ধব্ধবে ফর্সা রং, নধরকান্তি দেহ। পরনে রক্তবর্ণের গেরুয়া, পায়ে খড়ম, কপালে সিঁদুরের টিপ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মুখে কুচ্কুচে কালো একরাশ গোঁফদাড়ি। এমন একজন গুরুদেবকে সিদ্ধপুরুষ ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। তিনি এসেই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, ছোট্টুদের সংসারে এখন খুবই দুঃসময়, তাই শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করছেন, কুপিত শনির দৃষ্টি থেকে সংসারটা বাঁচাতে। দৈবশক্তির অধিকারী তিনি মাকে বলে কিছু সোনার গয়না নিয়েছেন, সেই শক্তির পরীক্ষা দেখাবেন, ডবল করে দিয়ে।

মা বললেন, "ছোট্টু, ও ঘরে গুরুদেব রয়েছেন, যাও, দেখা করে, প্রণাম করে এসো।"

ছোট্টুও যথারীতি চশমা-চোখে গুরুদেবকে প্রণাম করতে গেল। গুরুদেবের পায়ে হাত দিতে, হাত তুলে ছোট্টুকে তিনি আশীর্বাদ করলেন, "বুড়ির ছোট ছেলে বুঝি, কোন্ ক্লাসে পড়ছ, বাবা ?"

"ফাইভে।"

"দেখি হাতখানা—"

ছোট্টু তার ডান হাতটা গুরুদেবের সামনে এগিয়ে দিল। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত রেখাগুলো আতশ-কাঁচ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে, গম্ভীর হয়ে বললেন, "বাবা, বুড়িকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও, দরকার আছে।"

চশমা-চোখে ছোট্টুর কাছে গুরুদেবের আসল চেহারাটি ইতিমধ্যে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। ভেতর থেকে কে তাকে বলে দিল, গুরুদেব লোকটি মোটেই ভাল নয়।

গুরুদেব তখন মা'কে বোঝাচ্ছেন, ছোট্টুর এক মস্ত ফাঁড়া রয়েছে এ বছরেই, সেটা কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। মা তো আতঙ্কিত হয়ে, গুরুদেবের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন।

ছোট্টু ততক্ষণে ছোট্কাকে সব কথা সবিস্তারে বলে দিয়েছে। ছোট্কা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বাবার সঙ্গে বেশ কিছু পরামর্শ করলেন। মা যে একজন ঠগ-গুরুদেবের পাল্লায় পড়েছেন, তাও একটু পরে পরিষ্কার হয়ে গেল জলের মতো।

ছোট্কা গুরুদেবের পালটানো পেতলের গয়নাগুলো যজ্ঞের স্থান থেকে তুলে, লুকনো আসল গয়নার সঙ্গে আবার পালটে রাখলেন।

এক হাতে ডিশ ভর্তি মিষ্টি, অন্য হাতে দুধের গ্লাস নিয়ে মা গুরুদেবের ঘরে ঢুকছিলেন। মাঝখান থেকে ছোট্কা পথ আগলে বললেন, "রাঙাবউদি, ওগুলোর আর দরকার হবে না। পুলিশ এসে গেছে, তারাই এখন থেকে গুরুদেবকে খাওয়াবে।"

খানিক বাদেই ঠগ-গুরুদেব মাথা নিচু করে পুলিশের পিছু-পিছু ছোট্টুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। ছোট্টু দেখল, মা একেবারে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

ছোট্কা অতঃপর ছোট্টুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ছোট্টু, তোর রহস্যটা এবার আমায় জানাবি ? তোকে আমি হজমি চুরির দায়ে কত কী বলেছি, আজকে দেখছি, তুই তো সব মহা-চোরদের ধরিয়ে দিলি।"

ছোট্টু একটু বিজ্ঞের হাসি হাসল।

চশমাটার যে এত দাম, সেদিন পর্যন্ত বোঝেনি ছোট্টু। ক্লাস ফোর-এর সঙ্গে ফাইনাল খেলায়, মানে, হরিচরণ মেমোরিয়াল ফুটবল শিল্ডে মরণ-পণ লড়তে হবে ছোট্টুদের। জুনিয়ার ক্লাসকে হারাতে না পারলে তাদের মান-সম্মান ধুলোয় লুটোবে।

পল্টু অনেক বারণ করেছিল, "ছোট্টু, চশমা পরে খেলিসনি।"

কিন্তু ছোট্টুর কী মনে হল, চশমা ছাড়া তো খেলার ফলাফল আগে থেকে জানতে পারবে না, তাই জেদ চেপে গেল তার।

খেলতে নেমে, শুরুতেই ওদের স্টপারের সঙ্গে মাঝ-মাঠে ছোট্টুর একটা চার্জ হতেই, চোখ থেকে চশমাটা হঠাৎ ছিটকে পড়ে পায়ের নীচে গুঁড়িয়ে গেল।

ছোট্টুর চোখের সামনে সারা বিশ্বের আলো যেন নিভে গেল তক্ষুনি।

পরপর এতগুলো কীর্তির অধিকারী এই ছোট্টু, একটা চশমার অভাবে একেবারে চুপ্সে গিয়ে অতি সাধারণ একটা ছেলেতে পরিণত হয়ে যাবে ! সেদিন খেলায় হারের জন্যে যত না মন খারাপ হয়েছিল, চশমাটা অমন করে গুঁড়িয়ে যাওয়াতে তার হাজার গুণ বেশি। ছোট্টু যেন ভেতরে ভেতরে একেবারে গুঁড়িয়ে গেল।

ছোট্কা পরের দিন বললেন, "নে ছোট্টু, মন খারাপ করিসনি। চল, নেপালদার ওখানে, তোকে আজই আবার নতুন চশমা করিয়ে দেব।'

কিন্তু নেপালকাকুর দোকানে চশমা করাতে এসে দেখা গেল, দোকানটি ইতিমধ্যে হাতবদল হয়ে গেছে। নেপালকাকু অন্য এক ভদ্রলোককে বেচে দিয়ে, হিমালয়ের উদ্দেশে আবার পাড়ি জমিয়েছেন। বউবাজারে তো আরও অনেক ভাল-ভাল চশমার দোকান রয়েছে। তবুও দু'চোখে জল ভরে এল ছোট্টুর। নেপালকাকু ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে সে চশমা নেবে না।

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

ভগীরথ মিশ্র

বেলা এগারোটা নাগাদ মা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সেই সকাল থেকে শুরু হয়েছে একের পর এক। দম ফেলবার ফুরসত নেই। আজ আবার কাজের লোক আসেনি। ফলে বার বার কাপ-প্লেট ধুতে ধুতে মেজদির হাতে কড়া পড়ে গেল। ছোড়দাকে বার-পাঁচেক সাইকেলে চড়ে মিষ্টির দোকানে যেতে হয়েছে। কলতলায় বসে সেও এখন হাঁফাচ্ছে।

আজ আমাদের সকালটা শুরু হয়েছে এইভাবে। তখন সবে ভোর হয়েছে। সূর্য ওঠেনি। মা সবে বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছেন। গেটের বাইরে থেকে ডাক পাড়লেন ব্যোমকেশদাদু, "ও বউমা, গেটটা খোলো মা। ওহ্, তোমার এই কুকুরকে ধরতে আমার জান বেরিয়ে গেল।"

মা তাড়াতাড়ি গেটের তালা খুলে দিয়েই অবাক। ব্যোমকেশদাদুর হাতে একগাছি পাটের দড়ি। তাতে বাঁধা রয়েছে এক ল্যাকপেকে কালো রঙের কুকুরের বাচ্চা।

হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন ব্যোমকেশদাদু। বললেন, "বাড়ি থেকে সবে দু'পা বেরিয়েছি, দেখি মূর্তিমান ছাইগাদার ওপর শুয়ে শুয়ে নিজের পা নিজে চাটছে। হর্ষ কাল যেমন বর্ণনাটি দিয়ে এসেছে, ঠিক-ঠিক মিলে যাচ্ছে। কিন্তু ধরা কি দেয় ? শেষে রামুর চায়ের দোকান থেকে একটা বিস্কুট ধারে কিনলাম। সে ব্যাটাও কি সকালবেলা ধার দিতে চায় ? বলে, বউনি হয়নি। অনেক বলে কয়ে···। বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে বাছাধনকে তো কাছে আনলাম। কিন্তু বাঁধি কী দিয়ে ? আমি তো আর কুকুর ধরতে বার হইনি। আমি বেরিয়েছি মর্নিংওয়াকে। রামুর চায়ের দোকানে তো সার-সার দড়ির খাটিয়া। তারই একখানা দড়ি ছিঁড়ে নিয়ে কোনওমতে ব্যাটাকে বাঁধলাম। যাক গে, এবার তোমার কুকুর তুমি বুঝে নাও মা। কুকুর ধরতে গিয়ে আজ আমার মর্নিংওয়াকটাই মাটি," বলতে বলতে ব্যোমকেশদাদু কুকুরের বাচ্চাটাকে বেঁধে দিলেন রেলিংয়ে।

মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "বসুন বসুন, চা করি।"

"আবার চা ?" ব্যোমকেশদাদু বসলেন।

মা রান্নাঘরে গিয়ে সাত-তাড়াতাড়ি চায়ের জল চাপালেন। তখনও তো তিনি বুঝতে পারেননি, কত দুর্ভোগ আজ রয়েছে তাঁর কপালে !

চা-বিস্কুট খেয়ে ব্যোমকেশদাদু বিদেয় হতেই, মা হেসেই খুন। বললেন, "ওরে, তোরা দেখে যা কাণ্ড।"

পুরো ঘটনার অর্ধেকটা আমরা জানি। বাকি অর্ধেকটা মায়ের কাছে শুনলাম।

গতকাল আমাদের কুকুরবাচ্চা রোবটকে পাওয়া যাচ্ছিল না। রোবট আমাদের সকলেরই খুব আদরের। কালো কুচকুচে রঙ। গোল-গোল চোখ। লেজটি সরু। জাতে দো-আঁশলা হলেও, নেড়ির দিকেই পাল্লাটা ভারী। ও হারিয়ে যাওয়াতে আমাদের মন খুব খারাপ।

সন্ধেবেলায় জেঠুমণি এসে বললেন, "ভাবিসনে তোরা। চেনাজানা সব্বাইকে বলে রেখেছি। ও কুকুর হারিয়ে গিয়ে রেহাই পাবে না। ধরা পড়বেই। দেখে নিস।"

রাতে খেয়েদেয়ে যখন শুতে যাচ্ছি, তখনই আচম্‌কা রোবট এসে হাজির। আমরা সবাই রোবটকে ফিরে পেয়ে মনের খুশিতে নাক ডাকিয়ে ঘুমোলাম রাতে। আর সক্কাল বেলাতেই ব্যোমকেশদাদু এসে হাজির।

রেলিংয়ে বাঁধা কুকুরছানাটিকে দেখে আমরা হেসেই বাঁচিনে। ব্যোমকেশদাদু কোত্থেকে এক রাস্তার কুকুরকে এনে গছিয়ে দিয়ে গেলেন।

আমি বললাম, "মা, তুমি কেন ব্যোমকেশদাদুকে বললে না, এ কুকুর আমাদের নয়। আমরা রোবটকে পেয়ে গেছি কাল রাতেই।"

মা হেসে বললেন, "থাক্। বুড়োমানুষ, কাকভোরে অতটা পথ বয়ে এসেছেন। শুনলে ভারী দুঃখু পেতেন। এটাকে বরং দড়ি খুলে বাইরে ছেড়ে দিয়ে আয়।"

মায়ের কথা তখনও শেষ হয়নি। গেটের বাইরে মুক্তিকাকার গলা শোনা গেল, "এই যে বউদি, এই নাও তোমার কুকুর। বাপ্ রে, কী নোংরা খেয়েছে ! মেখেছে আরও বেশি।' দেখি, আরও একটি কালো রঙের কুকুরের বাচ্চা মুক্তিকাকার হাতের দড়িতে প্রায় ঝুলছে।

মা শুনেই ছুটলেন চায়ের জল চড়াতে।

মুক্তিকাকার পর এল গদাধরদা। তারপর এল পটলমামা। ওর বন্ধু। নতুন বাজারের রাঙামেসো। গোঁসাইপাড়ার গোবিন্দ শর্মা। সবার হাতে একটি করে কালো রঙের কুকুরের বাচ্চা। মায়ের দম ফেলবার জো রইল না। কেটলি-কেটলি চা ফুরিয়ে গেল। শুঁড়ো চা কিনতে ছোড়দা ছুটল বাজারে।

বিস্কুট, চানাচুর, মিষ্টি এল দফায় দফায়।

এদিকে এতগুলো কুকুরের জমায়েত দেখে রোবট গেল খেপে। তার চিৎকারে কান পাতা দায় হল।

বাবা বললেন, "এত কালো কুকুরের বাচ্চা কোত্থেকে এল এ শহরে ? কেউ কুকুর তৈরি কারখানা খুলেছে নাকি ?"

ছোড়দা বলল, "বা-রে ! এই তো সবে শীত গেল। এ শীতে প্রচুর কুকুরের বাচ্চা জন্মেছে। রাস্তাগুলো গিজগিজ করছে কুকুরের বাচ্চাতে। জোরে সাইকেল অবধি চালানো দায়।"

মা বললেন, "আর পারিনে। চা করে করে হাত ধরে গেল। এবার এলে আর চা-টা দিচ্ছিনে।"

বাবা বললেন, "তাও কী হয় ! কত তাবড় মানুষ এরা। কত মেহনত করে কুকুর ধরে এতটা পথ আসছে। একটু চা-বিস্কুট না দিলে মান থাকে না। নাই বা হল আমাদের কুকুর।"

বেলা ন'টা থেকে আসতে লাগল জেঠুমণির অফিসের লোকজন। একের পর এক আসে। চা-মিষ্টি খায়। কুকুর জমা দিয়ে চলে যায়।

জেঠুমণির কাজ-কারবারই এই রকম। একটা কুকুরের বাচ্চা হারিয়েছে। সে খবরটা সারা শহরের মানুষকে দিয়ে এসেছেন বুঝি। সকাল থেকে এগারোটা অবধি এসেছে ছাব্বিশ জন। আরও কত জন আসবে কে জানে !

কিন্তু যার জন্য এত সব কাণ্ড, সেই জেঠুমণি কিন্তু ধরাছোঁয়ার বাইরে। বেগতিক দেখে তিনি সাতসকালে চানটি সেরে সেই যে পুজোর ঘরে ঢুকেছেন, এখনও অবধি বার হওয়ার নাম নেই।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া তখনও পুরোপুরি মেটেনি। ছোড়দা ছুটতে ছুটতে রান্নাঘরে এসে হাজির। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "আবার কুকুর এসেছে। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

মা খেপে গিয়ে বললেন, "বলে দে, আমাদের কুকুর পাওয়া গেছে।"

ছোড়দা বলল, "বলেছিলাম তো। ওরা শুনছে না। বলছে, সেই নতুন পাড়া থেকে বহু মেহনত করে এনেছে, জেঠুমণিকে একটিবার না দেখিয়ে যাবে না। তা ছাড়া···"

"তা ছাড়া কী ?"

"তা ছাড়া, ওরা রিক্‌শা করে এসেছে, রিক্‌শার ভাড়া নেবে জেঠুমণির কাছ থেকে।"

"তবে তোদের জেঠুমণিকে বল্ গে যা। উনি গিয়ে কুকুর সামলান। আমি আর পারিনে," মা গজগজ করতে লাগলেন।

জেঠুমণিকে বলতেই আর এক ফ্যাসাদ। বাইরের থেকে তিনি হাঁক পাড়লেন, "ওরে, বউমাকে বল এদের সবাইকে শরবত দিক। রোদে ঘেমে-নেয়ে বাছারা একশা। ওরে ও পল্টু, একটা ভাঁড়ে করে কুকুরছানাটাকে একটু জল দে তো। হাঁফাচ্ছে।"

শুনে মা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

শরবত খেয়ে, রিক্‌শা ভাড়া নিয়ে ওরা সবে গেটের বাইরে বেরিয়েছে এমন সময় আরও দু-তিনটি দলকে দেখা গেল। মা তখন তেত্রিশ কোটি দেবতাকে ডাকতে শুরু করেছেন। এক বালতি জলে ঢেলে দিয়েছেন কেজি-দুয়েক চিনি। এখনও কত দল আসবে কে জানে !

বেলা তিনটে নাগাদ যখন একুশজন হাজির হল কুকুর সহ, তখন জেঠুমণি সবাইয়ের গঞ্জনায় অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "ভাবিসনে। এক্ষুনি ব্যবস্থা নিচ্ছি আমি," বলেই গেটের দিকে পা বাড়ালেন জেঠুমণি।

কুকুর আসা কিন্তু চলতেই থাকল। দফায়-দফায় চা-মিষ্টি-শরবত জোগাতে জোগাতে মা যখন জেরবার, তখন ছোড়দা দিল এক দারুণ যুক্তি। বলল, "জনে-জনে চা-মিষ্টি না খাইয়ে প্রত্যেককে একটা করে কুপন ধরিয়ে দিলে হয় না মা ? ভোলাদার দোকানে কুপন জমা দিয়ে খেয়ে নেবে সবাই।"

মা বললেন, "দূর পাগল ! তাও আবার হয় নাকি ?"

ছোড়দা বলল, "কেন হবে না ? আমরা তো জলসার সময় ভলান্টিয়ারদের কুপন দিই। ঝামেলা কত কমে যায়।"

সন্ধেয় কুকুর আসার হিড়িকটা খানিক কমল। সারা দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর মা সবে বিছানা নিয়েছেন, হঠাৎ গলির মোড় থেকে ভেসে এল মাইকের গমগমে আওয়াজ :

আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ !

পুরনো বাজার নিবাসী শ্রীহর্ষকেতন চক্রবর্তীর গৃহপালিত কুকুরের বাচ্চাটি, যাহা গতকল্য হারাইয়া গিয়াছিল, তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে সহৃদয় আত্মীয়-বান্ধব এবং জনসাধারণের প্রতি শ্রীহর্ষকেতন চক্রবর্তী মহাশয়ের বিনীত আবেদন এই যে, কুকুরের বাচ্চাটিকে আর খুঁজিবার প্রয়োজন নাই। গতকল্য হইতে আজ পর্যন্ত চক্রবর্তী পরিবারের যে সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষীগণ অপরিসীম ক্লেশ স্বীকার করিয়া উক্ত কুকুরের বাচ্চার সন্ধানে তাঁহাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইতি বিনীত শ্রীহর্ষকেতন চক্রবর্তী, পুরনো পাড়া।

মাইকের আওয়াজ কাছাকাছি আসতেই সবাইয়ের চোখ ছানাবড়া। একখানা রিক্‌শায় মাইক-ব্যাটারি সহ শোভা পাচ্ছেন স্বয়ং জেঠুমণি। কম্বুকণ্ঠে গর্জন তুলছেন : আনন্দ সংবাদ ! আনন্দ সংবাদ !

আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে রিক্‌শা চলে গেল পোস্টঅফিসের দিকে। রিক্‌শায় বসেই জেঠুমণি বললেন, "ওদিকটা বার-তিনেক চক্কর মেরেছি। এবার পোস্টাফিসের দিকটা শুরু করব। দেখিস, কাল থেকে যদি একটিও কুকুরের বাচ্চা আসে। জেঠুর মাইকের আওয়াজ ক্রমেই মিলিয়ে গেল দূরে।

রাত এগারোটার পর সবাই চিন্তায় পড়ল। জেঠুমণি এখনও ফেরেননি। তিনি না ফিরলে কেউ ঘুমোতে যেতে পারছে না।

বাবা, ছোড়দা, বৃন্দাবনদা বার হল রাত বারোটা নাগাদ। আমরা বসে বসে ঢুলতে লাগলাম বারান্দায়।

একটা-দুটো-তিনটে-চারটে। দেখতে দেখতে পাঁচটা বেজে গেল। আঁধার কেটে ভোর হয়ে গিয়েছে। এমনি সময় গেটের সামনে এসে দাঁড়াল একখানা রিক্‌শা। পিছন-পিছন তিনটি প্রাণী। এক লাফে রিক্‌শা থেকে নেমে পড়লেন জেঠুমণি। পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে এগিয়ে দিলেন রিক্‌শাওয়ালার দিকে। বললেন, "যাবার পথে মাইকের ভাড়াটাও দিয়ে যাস বিমলের দোকানে," বলেই তিনি গটমট করে উঠে গেলেন দোতলায়। যেন এইমাত্র দিগ্বিজয় সেরে ফিরলেন।

ছবি : দেবাশিস দেব

(অসমিয়া গল্প)

মহারানির বুদ্ধি

বীণা মিশ্র

আড়াইশো বছর আগে অসমের ইতিহাসে এক রানির নাম পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন অসমের প্রথম রানি, নাম ফুলেশ্বরী। তাঁর ধার্মিক স্বামী রাজা শিবসিংহ তাঁর হাতে রাজ্যের সব ভার ছেড়ে দিয়ে পুজোআচ্চা নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকতেন। ফুলেশ্বরী বহু জনহিতকর কাজ করে গেছেন। তাঁর নামে মুদ্রাও প্রচলিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমতী। তাঁর বুদ্ধির বিষয়ে বহু গল্প প্রচলিত আছে। তারই একটা আজ তোমাদের শোনাচ্ছি।

রংপুর শহরে মস্ত বড় এক তুলোর গুদাম ছিল। এই গুদামের মালিক ছিল চার ভাই। তাদের রোজগারও বেশ ভালই ছিল। সুখে শান্তিতেই তাদের দিন কাটছিল, কিন্তু হঠাৎ এক বিপদ দেখা দিল। কোত্থেকে একপাল ইঁদুর এসে গুদামকে তছনছ করে দিতে লাগল। কী করে ইঁদুরের উৎপাত থেকে গুদামকে রক্ষা করা যায়, এই নিয়ে চার ভাই পরামর্শ করতে বসল। যথেষ্ট টাকা-পয়সা থাকলেও তারা ছিল খুব কৃপণ, তাই অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করল, একটা হুলো বেড়াল পুষবে, আর তার জন্য যে খরচ পড়বে চার ভাই তা সমান ভাগে ভাগ করে দেবে। কথামতো বেড়াল কেনা হল। সবাই বেড়ালের সমান মালিক, কাজেই তার চারটে পা চার ভাইয়ের জিম্মায় পড়ল। যে যার পা'কে যত্নআত্তি করে, ধোওয়ামোছা করে, গয়নাগাটি দিয়ে সাজায়। এমন আদর-যত্ন পেয়ে বেড়ালও মনের আনন্দে গুদামের ইঁদুর-বংশ ধ্বংস করে চলল।

বেশ শান্তিতেই দিন কাটছিল, হঠাৎ একদিন এক দুর্ঘটনা ঘটল। কী করে জানি না, বেড়ালের একটা পা ভেঙে গেল। সেই পা'টা ছিল ছোট ভাইয়ের ভাগে। কাজেই সে ভাঙা পায়ের পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রেড়ির তেলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে পায়ে পটি বাঁধতে যাচ্ছে, এমন সময় রান্নাঘর থেকে মাছভাজার গন্ধ পাওয়া গেল। বেড়ালকে আর পায় কে! পায়ের দুঃখ ভুলে গিয়ে সে পাগলের মতো একলাফে গিয়ে পড়বি তো পড় একেবারে উনুনের ওপর। সঙ্গে-সঙ্গেই তার পায়ে বাঁধা ন্যাকড়াতে আগুন ধরে গেল। বেড়াল ভয় পেয়ে আর এক লাফে গুদামে গিয়ে পড়তেই তুলোয় আগুন ধরে গেল। দেখতে দেখতে সব তুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গুদাম একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। ভাইরা হায় হায় করতে লাগল। শোকের বেগ একটু কমলে, বড় তিন ভাই ভাঙা পায়ের মালিক ছোট ভাইয়ের ওপর রেগে আগুন হয়ে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তার বিরুদ্ধে রাজদরবারে নালিশ করল। সব ঘটনা শুনে মন্ত্রীমশাই গুদামে আগুন লাগাবার জন্য ছোট ভাইকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। তিনি রায় দিলেন, সাত দিনের মধ্যে তাকে গুদামের সব তুলোর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, তা না হলে কয়েদখানায় যেতে হবে। ছোট ভাইয়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কী করে সাত দিনের মধ্যে এত বড় গুদামের এত টাকা সে জোগাড় করবে? ভাবনায় চিন্তায় দু'দিনের মধ্যেই তার শরীর শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেল।

ছোটভাইয়ের বউয়ের এক সই ছিল মহারানি ফুলেশ্বরীর দাসী। সইয়ের দুর্দশা দেখে তার মনে বড় দুঃখ হল। সে ভাবল মহারানিকে এই ব্যাপারে একটু বলে দেখলে কেমন হয়। যদি তিনি কোনও সুরাহা করতে পারেন। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর মহারানি যখন বিশ্রাম করছেন, তখন তাঁর সেবা করতে করতে দাসী তাঁকে বিচার-সভার সব কাহিনী বলল। শুনে ফুলেশ্বরী বললেন, "ভাবিস না, আমি কাল চার ভাইকে আবার বিচার-সভায় ডাকব।"

পরদিন মহারানির আদেশে চার ভাই রাজসভায় হাজির হল। ফুলেশ্বরী নিজে বিচার-সভায় বসলেন। তিনি চার ভাইকে প্রশ্ন করলেন, "তোমরা সবাই বেড়ালের মালিক, তাই না?"

হাত জোড় করে তারা বলল, "হ্যাঁ, রানিমা।"

আবার প্রশ্ন হল, "তোমরা প্রত্যেকে বেড়ালের পা ভাগ করে নিয়েছিলে তো?"

একবাক্যে সবাই উত্তর দিল, "হ্যাঁ রানিমা, তাই করেছিলাম।"

"তোমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের ভাগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছিলে তো?"

সমস্বরে উত্তর হল, "হ্যাঁ, রানিমা।"

"আচ্ছা, খোঁড়া পায়ের মালিক গুদামে আগুন লাগাবার জন্য বেড়ালকে ছেড়ে দিয়েছিল, তাই না?"

উৎফুল্ল স্বরে তিন ভাই বলল, "হ্যাঁ, রানিমা, ঠিক কথাই বলেছেন।"

এবার রানিমা একটি মোক্ষম প্রশ্ন করলেন, "তোমাদের ভাগের পা'গুলোকে তোমরা তখন আটকে রাখলে না কেন? সেগুলোর দায়িত্ব তো তোমাদের ওপরই ছিল। ও কি এক পায়ে ছুটে যেতে পারত?"

সবাই একেবারে চুপ। মহারানি বললেন, "তোমরা যখন তোমাদের কাজে ফাঁকি দিয়েছ, তখন তোমরাও সমান দোষে দোষী, কাজেই ক্ষতিপূরণও চারজনকেই সমান ভাগে করতে হবে।"

তিন ভাইয়ের মুখ কালো হয়ে গেল, ছোট ভাইয়ের মুখে হাসি ফুটে উঠল। বুদ্ধিমতী ফুলেশ্বরীর বিচারে তার জয় হল।

ছবি : দেবাশিস দে-ব

চমৎকার প্রমোদ-তরী ! মালিক কে ? দারুণ হুল্লোড় চলছে দেখছি !
যাত্রী কারা জানো ? ডিউক, ডাচেস, ফিল্ম-স্টার ! সবাই বিখ্যাত লোক ! বুঝলে ?
আরে, এ যে টিনটিন ! আর সেই লোকটা···কী নাম যেন···প্যাডক !
যাই, ওদের স্বাগত জানাই ।
মার্কুইস দ্য গর্গনজোলার এই জাহাজে স্বাগত, হে বন্ধু !
ওরে বাবা, এ যে সেই সিনোরা কাস্তাফিয়োরা !
এসো টিনটিন !
এসো প্যাডক ! নাকি তোমার নাম হ্যারক ?
আমার নাম হ্যাডক !
সিনোরা, লর্ডশিপ জানাচ্ছেন, ওঁরা ক্লান্ত, তাই ওঁদের আলাদা ঘরে বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়েছে ।
তাই নাকি ?
খানিক বাদে···
পার্কার, কী বলল ওরা ?
বলল যে, একটা বজরায় করে মক্কায় যাচ্ছিল ।
পথের মধ্যে কয়েকটা প্লেন ওদের তাক করে বোমা ফেলে । বজরায় আগুন ধরে যাওয়ায় ওরা ডিঙিতে ভেসে পড়েছে । একজন পাইলটকে ওরা উদ্ধার করেছে । সেও ওদের সঙ্গে আছে ।
ঠিক আছে, পার্কার ।
একটা কথা । সিনোরা কাস্তাফিয়োরা ওদের চেনেন । তিনি ওদের স্বাগত অভ্যর্থনা জানিয়েছেন ।
বটে ?
ওঃ, একেবারে জামাই-আদরের ব্যবস্থা ! স্বপ্ন দেখছি না তো ?
কী হল টিনটিন ? কথা বলছ না কেন ?

লোহিত সাগরের হাঙর

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

যত দোষ নন্দ ঘোষ ! সেই নন্দ ঘোষ এখন রয় !

সম্প্রতি জিওফ গাইলসকে মেলবরোর কাছে বেচে দিয়ে সকলের ধিক্কার কুড়িয়েছে রয়। এদিকে গোলকিপার চার্লি কার্টারের দোষে লিগ কাপ থেকে রোভার্সকে বিদায় নিতে হয়েছে। রয়কে এখন খুঁজতে হচ্ছে বদলি গোলকিপার ...

বাঃ, চমৎকার বাঁচিয়েছ ওয়াল্টার !

পরের শটটা বাঁ দিকে যাবে !

রোভার্সের জেনারেল ম্যানেজার বেন গ্যালোয়েও সব দেখছে...

রয় বল না-ধরে ও স্রেফ ঠেলে দিচ্ছে কেন ?

হবে, হবে, সময়ে সব হবে !

আপাতত ও বলগুলোকে ঠেকাতেই ব্যস্ত।

ঠেকিয়েছে !

ওয়ালি, বেশ খেলেছ। সামনের শনিবার মেলবরোর বিরুদ্ধে তোমাকে গোলে নামাচ্ছি !

সে কী

চার্লি কার্টার খেলবে না ?

সে-সব আমি বুঝব !

এবারে বাড়ি গিয়ে তোমার বাবা-মা'কে জানাও যে, তুমি 'এ' টিমে চান্স পেয়েছ।

ওয়ালি তো বিমূঢ়...

রয়, সতেরো বছরের একটা বাচ্চাকে গোলে নামানো, তাও মেলবরোর বিরুদ্ধে, কি ঠিক হচ্ছে ?

আমার ধারণা, ওয়ালি খারাপ খেলবে না !

যদি খারাপ খেলে, আর জিওফ যদি গোল দেয়, রোভার্সের সদস্যরা তা হলে তোমাকে ছিঁড়ে খাবে।

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে ক্লান্ত রয় ভাবছে…
বেন ভুল বলেনি। এদিকে চার্লিও ট্রান্সফার চাইছে। বিপদ তো একা আসে না !
টিভি দেখতে-দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছে রয়…
বাঃ, চমৎকার ! জাগিয়ে লাভ নেই, ঘুমোক !
ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে রয়। মেলবরোর বিরুদ্ধে খেলা…
ওঃ, গাইলস আজ দুর্দান্ত খেলছে !
গাইলস হ্যাটট্রিক করল !
ধুর ধুর, উইলি এবারেও আটকাতে পারল না
জিওফ গাইলসকে বেচলে কেন ?
জবাব দাও, জবাব দাও !
ছিঃ রয়, ছিঃ !
মেলবরোর ম্যানেজার অ্যান্ডি জ্যাকসন আহ্লাদে আটখানা !
তোমার দিন শেষ হয়েছে, বুঝলে ?
কী হে, রয় ?
না, না।
না, না !
বাবাঃ, চিৎকার করে সবাইকে জাগিয়ে দিয়েছ !
কাঁদিসনে মেলিনা ! বাবা স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়েছে !
স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন !
সত্যি হলে সর্বনাশ হবে !
সেক্ষেত্রে আমার চাকরি খতম হবে। বুঝলে ?
রোভার্স আর মেলবরোর খেলা এবারে আসছে। তৈরি থাকো !
এর পরে আগামী সংখ্যায়

ব্রেকফাস্ট তো কাঁচামাছ, তা পাচ্ছি কোথায়...

কট্‌কটির মাঠে

বিমান রাউত

কট্‌কটির মাঠে আমগাছে পা-ঝুলিয়ে বসে বসে তুরুশ্চু তার গত জন্মের কথা ভাবছিল। আজকাল সব কথা মনেও পড়ে না। পঁয়ত্রিশ বছরের ধুলোবালি চাপা পড়া স্মৃতিতে মনুষ্য-জীবনের সব কথাই প্রায় মুছে গেছে। একটা কাক ভুল করে উড়ে এসেছিল খানিক আগে এদিকে, ভৌতিক কাণ্ডকারখানার প্রথম বর্গের ছোট্ট কায়দাটা খাটাল তুরুশ্চু, জিভটাকে আঁকশির মতো লম্বা করে আমপাড়ার মতো নামিয়ে আনল কাকটাকে।

বড় খিদেও পেয়েছিল। দেরি করে ঘুম ভাঙার জন্য কট্‌কটির বিলে মাছ ধরতে যাওয়া হয়নি। সাধারণত পাখপাখালি এদিকপানে আসে না। তুরুশ্চু'র পাল্লা আরও দূরে। তবে বছর কয় আগে একটা পেরেতের সঙ্গে জবর টক্কর লাগার পর থেকে মনের দুঃখে তুরুশ্চু আর বেশি দূর যায় না। এই ধুধু প্রান্তরে বিশ একর জমি, জলা ঘিরে ভূতরি আল দিয়ে গণ্ডি বেঁধে সে বাস করছে একা একা।

কাকটা এল কী করে ? খচ্‌খচ্ করে তুরুশ্চু'র মনটা। তার আল সে নিজে ঢিলে না করলে পাখপাখালি ঢোকে কী করে ? ছাগল-টাগল দিয়ে জলযোগ হয় না। তুরুশ্চু মাছ ভালবাসে। মাঝেমধ্যে মুখ পালটানোর জন্য গণ্ডি ঢিলে করে দেয়। তখন পাখিটাখি ঢুকলে ধরে নেয়।

ভাবতে-ভাবতে সে অনেক দিন আগের কথা মনে করে। গঞ্জে সে গেছে অনেকবার, গঙ্গা পেরিয়ে জমজমাট গঞ্জে কত কী মিলত। সেই পেরেতটার সঙ্গে টক্কর লাগার আগে দিব্যি ঘুরে বেড়াত। একদিন গঞ্জে দেখল থোলো হুঁকো হাতে কালোপানা এক নাদুসনুদুস মনিষ্যিকে। মগজে চিড়িক মারে, হিরু নয় তো ? ডাকবে নাকি ? ভূতেরা কী করে মনিষ্যিদের ডাকাডাকি করে তুরুশ্চু মনে করতে চেষ্টা করছে, এমন সময়ে মাথায় পড়ে এক বিরাশি সিক্কা চাঁটি। ভূতেদের পুলিস বড় কড়া। তুরুশ্চু একটা ঘোরতর অন্যায় করতে যাচ্ছিল বলে চাঁটিটা পড়ল।

সাতদিন লজ্জায় ঘেন্নায় সে বিছানা থেকে ওঠেনি। সেই থেকে সে ঘোরাঘুরি কম করে। কী দরকার তার ফের চাঁটি খেয়ে।

হঠাৎ তার আমগাছটা বোঁ করে ঘুরে গেল। চমকে পড়ে যাচ্ছিল তুরুশ্চু। কী কাণ্ড ! তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে এসে কোমরে ধুতিটা আচ্ছা করে জড়িয়ে নিয়ে তৈরি হতে থাকে সে। কোমরে বাতের ব্যথাটা চাগিয়ে উঠেছে। পুন্নিমে এল বোধহয়। সেই ভূতটা কি এখানেও এল নাকি ? ব্যাটা কোথায় ঘাপ্‌টি মেরে আছে ! এত বড় সাহস, তুরুশ্চু কি মরে গেছে ? ক্রিয়াকর্ম সেও জানে। আজ ব্যাটাকে টাইট দিতে হবে। হঠাৎ সে দেখে, শাঁশাঁ করে উড়ে আসছে একটা ঝাঁকড়া জারুলগাছ। তুরুশ্চু ভাবে, ব্যাপারটা কী। তার গণ্ডি ভেঙে কোন্ ভুতো এল তার খাসতালুকে।

আমগাছের পাশে ঝুপ করে নামে গাছটা। তারপর সড়াত করে নেমে আসে সবুজ চিচিঙ্গের আকারের এক পেরেত। পরনে লাল-ফতুয়া, হলুদ ধুতি, কানে পোড়া বিড়ি আর ধুতরোফুল গোঁজা। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তুরুশ্চুকে। "পেন্নাম বড়দা।"

নাক সিঁটকে জিজ্ঞেস করে তুরুশ্চু, "আমার আল ভাঙল কে ?"

নতুন পেরেত চোখ মট্‌কে বলে, "এ আল তো নস্যি বড়দা, এর চেয়ে আরও কঠিন কিছু হলেও ভেঙে দিতাম। রাগ

করেননি তো ?"

তুরুশ্চু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে,"নামটা কী ? বাড়ি কোথায় ছিল ?"

নতুন পেরেত বলে, "নাম আছে, কী বলব, কন্ধকাটা বলবেন। দেখাব নাকি ?"

তুরুশ্চু তাড়াতাড়ি চোখ ঢেকে বলে, "না, না, নার্ভে সইবে না। পঁয়ত্রিশ বছর অভ্যেস নেই। ভাল জিনিস দেখতে দেখতে চোখ তৈরি হয়ে গেছে। তা ভূততন্ত্রের ১২৯ ধারায় এইরকম আল ভেঙে অন্য ভূতের বসতে ঢুকলে কী ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, সেটি পড়া আছে তো ?"

কন্ধকাটা মাথা চুলকে বলে, "সে-সব পড়ার আর সময় পেলাম কই। ও-জন্মে ফুটবল লাথাতে লাথাতে বড় হলাম, শেষে মাউন্টেড পুলিশের ঘোড়ার লাথি খেয়ে পগার পার হয়ে মাস কয় আগে এদিকে। তবে আপনার কাছে এসে যখন পড়েছি, শিখিয়ে-পড়িয়ে দেবেন। যাক গে সে-সব কথা। বড়দা, আপনি ব্রেকফাস্ট করেননি এখনও ? আমার বড্ড খিদে পেয়েছে যে।"

তুরুশ্চু বলে, "ব্রেকফাস্ট তো কাঁচামাছ। তা পাচ্ছি কোথায় ?"

কন্দকাটা বলে, "কাঁচামাছ অতি বিচ্ছিরি জিনিস। বড়দা, এখানকার কর্তাদের বলুন না, ভৌতিক অভ্যাসটভ্যাস, নিয়মকানুন আর ধারাটারাগুলোকে একটু ঝেড়েঝুড়ে রিভিউ করতে। দূর, দূর, দিনকাল কত পালটেছে জানেন ? আজকালকার ভূতের গল্প না পড়লে বিশ্বাসই করবেন না ভূতেদের আচার-আচরণে কী দারুণ পরিবর্তন এসে গেছে। খাবার-দাবার তো পালটেইছে, তারপর ধরুন—সেই মান্ধাতা আমলের টেকনিক, খোনা স্বরে কথা বলা, হাড়ে-হাড়ে খটাখটি, রাত-দুপুরে সাদা শাড়ি পরে তেঁতুলগাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা—ওসব আজকাল চলে ? বড়দা, আপনি ওভেনে বেক করে মাছের রোস্ট খেয়েছেন ? খাননি। আমি খাওয়াব আপনাকে।"

তুরুশ্চু ভুরু কুঁচকে দ্যাখে কন্ধকাটাকে, তারপর বলে, "মতলবখানা কী তোমার ? আমি ওসবে নেই। চারদিকে ভুতুড়ে পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওইসব গরম-গরম কথার ভাপ বহুদূর যায়, জানো ?"

কন্ধকাটা হেসে বলে, "আপনি দেখুন না। সব ঠিক করে দিচ্ছি আমি। তবে, সাড়ে আটশো বছরের জঞ্জাল আর গণ্ডগোল তো আমি-আপনি দু'জনে সাফ করতে পারব না। আরও ভূত চাই। আপনি আপনার ওই ভুতুড়ে গণ্ডি তুলে দিন। আরও ভূত আসুক। সবার সঙ্গে সমস্যা নিয়ে কথা বলতে হবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।"

এমন সময় তুরুশ্চু'র নাকে কেমন একটা খাকি-খাকি গন্ধ ঢোকে। পুলিশের গন্ধ ! তার মানে, সাংঘাতিক। চোখ টিপে সে কন্ধকাটাকে থামিয়ে দেয়।

॥ ২ ॥

তিন হপ্তা কেটে গেছে। প্রাচীনে নবীনে মিলেমিশে আছে। আপনি থেকে তুমিতে নেমেছে ওদিকে, তুমি নেমেছে তুই-তে এদিকে।

কন্ধকাটা কথা রেখেছে। মাছের রোস্ট খাইয়েছে দু-তিনদিন। ওভেন পাবে কোথায় ? ছেলেটার মাথা আছে।

আলেয়ার আলো দিয়ে দিব্যি রোস্ট করেছে। অবিশ্যি এ ক'দিনই তুরুশ্চুর ধরা পাকা রুইমাছ দিয়েই রোস্ট হয়েছে।

তবে তুরুশ্চুর প্রথম-প্রথম বেজায় অসুবিধে হচ্ছিল। পঁয়ত্রিশ বছর একা থাকার অভ্যেস, পাশে একটা জলজ্যান্ত ভূত নিয়ে দিনদুপুরটা যা-ও কাটে, রাত্তিরে ঘুমোবার বেলা কী কষ্ট কী কষ্ট। এতদিনের অভ্যেস তো। ভয়-ভয়ও করে!

তা বলেও ফেলল একদিন। কন্ধকাটাকে আদর করে তুরুশ্চু ডাকে—নবা। বলল, "নবা, আমার বড্ড নাক ডাকে রে, তোর মিথ্যে কষ্ট পাওয়া কেন, তুই ওদিকে বাসাটা সরিয়ে নিয়ে যা। কিছু মনে করিসনে, কেমন?"

নবা বলে, "সত্যিই তোমার অসুবিধে হচ্ছে বড়দা?"

তুরুশ্চু চোখ কচলে বলে, "কী আশ্চয্যি, অসুবিধেটা তো তোরই হচ্ছে। তোর কম বয়স, রাতে না ঘুমোলে কষ্ট হবে না? আমার যা নাক ডাকে—"

নবা হেসে বলে, "আমার কোনও কষ্ট নেই। বড়দা, তোমার নাকে আমি একটা সাইলেন্সার লাগিয়ে দেব। তারপর এনে দেব নেজাল ড্রপ। কলকাতায় যেতে হবে।"

॥ ৩ ॥

এই বিশাল ধুধু প্রান্তরে দিনের বেলায় জলা থেকে আধমাইল দূরে-দূরে ছেলেরা ঢোকে গোরু-ছাগল নিয়ে। ভুলেও এদিকে আসে না। আমগাছটার পাশে যে একটা জারুলগাছ রাতারাতি গজিয়েছে, সেটি এদের চোখে পড়ার কথা নয়। দূর অনেক। দেখলে অবশ্য পালাত, আর আসতই না এদিকে।

কট্‌কটির মাঠের বদনাম বহুদূরে ছড়ানো। গেল ছ' মাসে চারটে পাঁচটে খুন হয়েছে। রাত্রিবেলা হাইওয়ে দিয়ে ট্রাক চালাতে চালাতে ড্রাইভার ক্লিনাররা দ্যাখে, জলার বুকে নীল-হলুদ আলোর রোশনাই। তারপর অন্ধকার। চোখ ফিরিয়ে তারা অ্যাক্সিলেটারে দেয় চাপ। পালা শিগগির!

লোকে বলে, ভূতের ডিপো ওই কট্‌কটির মাঠ। এসবই তুরুশ্চু শোনে আর হাসে। ক'টা ভূত আর আছে এ-তল্লাটে! কম ভূত বলে তাদের তালুকও বিরাট বিরাট।

নবা আসার পর, সে আর নবা মিলে এক জোড়া হয়েছে। তাদের শাস্ত্রে আছে, জোড়া ভূতে, দেয় না শুতে। কিন্তু ভূতের বাবার দিব্যি, নবা আর তুরুশ্চু লোককে জ্বালায় না। ওসবে নেই তারা। তাদের মাথায় এখন অন্য প্ল্যান। আরও ভূত চাই। তারপর আন্দোলন—ভূতেদের আদবকায়দা, চলনবলন সব পালটাতে হবে। সাড়ে আটশো বছরের বস্তাপচা নিয়মকানুনকে হটাতে হবে।

খুব সন্তর্পণে কথাবার্তা চালাচ্ছে ওরা। চারিদিকে ভূতেদের পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আন্দোলনের হদিসটি পেলে পিটিয়ে খোসা ছাড়িয়ে ডুগডুগি বাজাবে।

তা করছেও ভাবনাচিন্তা সন্তর্পণে। তবে, কী মুশকিল, ভূতেরা সব গেল কোথায়? হাপিত্যেস করে ভূত ধরার জন্য অপেক্ষা করতে করতে তুরুশ্চু জিজ্ঞেস করে, "হ্যাঁ রে নবা, স্যাঙাতগুলো গেল কোথা। গন্ধ নেই, হাওয়ায় শব্দ নেই, সেঁধিয়েছে কোথায় সব?"

নবা বলে, "ফরেনে গেছে বোধহয়।"

তুরুশ্চু তার মুখে থাবা দেয়। "এই নবা, ওই দ্যাখ, জলার পশ্চিম পারে অত লোকজন কিসের জন্য রে?"

॥ ৪ ॥

জোড়া ভূত হাঁ করে দেখে, জলার ধারে তা প্রায় একশো লোক জমে গেছে। ছ-সাতটা ট্রাক, তার ওপর প্রচুর শালখুঁটি, কাঁটাতার, আরও কত কী।

সুন্দর জামা, প্যান্ট, আর টুপি, কালো চশমা পরা তিন-চারজন নীল রঙের মস্ত বড় বড় কাগজ দেখছে আর অন্যদের কী সব বোঝাচ্ছে। ভূতের দৃষ্টি এক মাইল দূরের সব স্পষ্ট দেখছে! শুনতে পারছে না। ভূতেরা কানে খাটো হয়।

নবা বলে, "বড়দা, মনে হচ্ছে—"

তুরুশ্চু বলে, "নবা, আমারও মনে হচ্ছে—"

নবা বলে, "আমার মনে হচ্ছে, নাহ্, আমি গিয়ে শুনে আসি ব্যাপারটা কী।"

তুরুশ্চু বলে, "আমার মনে হচ্ছে, নাহ্, তুই যা, তোকে বলে কী লাভ!"

নবা বলে, "তোমার কী মনে হচ্ছে সেটি বলো দিকিনি।"

তুরুশ্চু কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে, "আমাদের বাস উঠল। মনিষ্যি দেখলেই আমার কান চুলকোয়, তালুতে সুড়সুড়ি লাগে তুই জানিস, তার মানেই অলক্ষুনে কিছু ঘটবে।"

নবা বলে, "দূর, দুর, তুমি বোসো, আমি জেনে আসছি। বলে কিনা অলক্ষুনে! এর চেয়ে ভাল হয় না, আমার মন বলছে।"

নবা গেল শাঁ করে, এল 'আঁ-আঁ' করতে করতে, "বড়দা, সব্বোনাশের মাথায় বাড়ি। এখানে রাসায়নিক কারখানা হচ্ছে। তোমার হাঁপানি নেই তো?"

তুরুশ্চু চোখ গোল করে ধমকে ওঠে, "জ্বালাসনে। খুলে বল, কী ব্যাপার!"

ওইখানে একটা রাসায়নিক ওষুধপত্তরের কারখানা হবে। আজ জায়গা মেপে তারকাঁটার বেড়া দিয়ে লোকজন চলে যাবে। শিগগিরই কারখানার ভিত্তি স্থাপন হবে। ছ'মাসের মধ্যে কাজ শেষ করে দিতে হবে। এ-সব নবা শুনে এসেছে।

তুরুশ্চু বলে, "তবে? হ্যাঁ রে নবা, কী ঠিক করবি কর। থাকতে পারব তো রে?"

নবা লাফিয়ে ওঠে, "পারব না মানে। আরও জমিয়ে থাকব। এইসব ফ্যাক্টরিতে প্রতি বছর চার-ছ'টা লোক দুর্ঘটনায় মারা পড়ে, আমি জানি। তাদের দলে টানব। আমাদের দল ভারী হবে। আমরা তখন সাড়ে আটশো বছরের বস্তাপচা ভূতের নিয়মকানুন পালটে দেব। তুমি হবে প্রেসিডেন্ট, আর আমি হব সেক্রেটারি। বুঝেছ বড়দা, হিপ্ হিপ্ হুররে, কী দারুণ ভুতুড়ে মজা!"

নৃত্যরত নবা'র দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তুরুশ্চু।

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

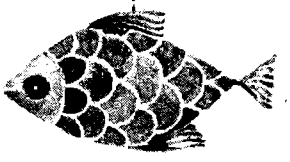

আশ্চর্য ফল

সুজিতকুমার নাহা

তেঁতুল, আমলকী বা পাতিলেবুর মতো কোনও টক জিনিস মুখে দিচ্ছ অথচ স্বাদ লাগছে দারুণ মিষ্টি, এরকম একটা অদ্ভুত ব্যাপারের কথা ভাবতে পারো ? যে আশ্চর্য ফলটির কথা আজ তোমাদের বলব, সেটি খাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কোনও টক খাবার চাখ্‌লে তোমাদের কিন্তু ঠিক এমনটাই বোধ হবে ! স্বাদ পরিবর্তিত হবার পিছনে রয়েছে যে বৈজ্ঞানিক কারণ, সে-বিষয়ে পরে আলোচনা করব ; তার আগে এসো, আমরা এই আশ্চর্য ফলটির সম্পর্কে কিঞ্চিৎ খোঁজ-খবর নিই !

ফলটির নাম 'অলৌকিক ফল' (মিরাকল বেরি)। অসাধারণ গুণের জন্যই যে এই বিচিত্র নামকরণ, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ! অবশ্য গাছটির পোশাকি নামটা বেশ খটোমটো— 'রিচার্ডেলা ডালসিফিকা'। পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চলে পাওয়া যায় এই গাছ। চারা লাগানোর কয়েক বছরের মধ্যেই ফল ধরে গাছে। সারা বছরই গাছে ফল থাকে।

এই ফলের গাছ যে-সব জায়গায় পাওয়া যায়, সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের কী মজা, তাই না ? বিটকেল রকমের টক স্বাদের জিনিসকেও নিখরচায় মিষ্টি লোভনীয় খাদ্যে রূপান্তরিত করতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না। শুধু বাগানে গোটাকতক অলৌকিক ফলের গাছ থাকলেই হল। অলৌকিক ফল ভক্ষণ করার পর টক খাবার মুখে দিলে যে-ধরনের মিষ্টি স্বাদ পাওয়া যায়, সেটা চিনির স্বাদের মতো। এখানে একটা প্রশ্ন তোমাদের মনে জাগতে পারে : অলৌকিক ফল খাওয়ার পর কোনও মিষ্টি খাবার (যেমন মধু) মুখে দিলে কি সেটি আরও বেশি মিষ্টি বলে বোধ হবে ? পরীক্ষায় দেখা গেছে এরকমটা হয় না। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, মিষ্টি স্বাদের খাবারের ওপর ফলটির কোনও প্রভাব নেই।

আগেই বলেছি, এই ফল খাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেও এর কার্যকারিতা বজায় থাকে। অলৌকিক ফলের এই গুণকে কাজে লাগিয়ে মজাদার নানা খাবার জিনিস প্রস্তুত করা যেতে পারে। যেমন ধরো, বিশেষ ধরনের চুয়িংগাম। সাধারণ চুয়িংগামের মিষ্টি স্বাদ পাওয়া যায় ওটি মুখে দেবার পরে খুব অল্প সময়ের জন্যেই। কিন্তু অলৌকিক ফলের স্বাদ-সমন্বিত বিশেষ ধরনের চুয়িংগামের মিষ্টি স্বাদ বজায় থাকবে বহুক্ষণ ধরে। বাজারে এই চুয়িংগাম পাওয়া গেলে খুবই ভাল হত, কী বলো ?

খাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেও কার্যকারিতা বজায় থাকে এই ফলের। অলৌকিক ফলের এই গুণকে কাজে লাগিয়ে নানা খাবার জিনিস তৈরি করা যায়। যেমন ধরো বিশেষ ধরনের চুয়িংগাম

অলৌকিক ফলের অলৌকিকত্বের পিছনে রয়েছে যে বৈজ্ঞানিক কারণ, সেটা আমরা এবার জেনে নেব। আসলে ফলটিতে আছে প্রোটিন জাতীয় একটি রাসায়নিক পদার্থ, যার কেরামতিতেই স্বাদ পরিবর্তনের ব্যাপারটা ঘটে থাকে। অনেক গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা ফলটি থেকে এই পদার্থটিকে আলাদা করতে সক্ষম হয়েছেন। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'মিরাকিউলিন'। মিরাকিউলিনের অণুর গঠন এবং যে-উপায়ে এটি টক খাদ্যের স্বাদের পরিবর্তন ঘটায়, সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা প্রাথমিকভাবে কিছু তথ্য জানতে পেরেছেন। এ বিষয়ে পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে এখনও গবেষণা চলছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উদ্ঘাটিত হওয়ার পর হয়তো বিজ্ঞানীরা মিরাকিউলিনের মতো আরও বহু পদার্থ গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রচুর পরিমাণে এগুলো তৈরি করতে পারলে উৎপাদনের ব্যয়ও কম পড়বে। কাজেই বিক্রয়মূল্যও হয়তো বেশি হবে না। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে মিষ্টি স্বাদের প্রয়োজনে এই ধরনের পদার্থের ব্যবহার শুরু হবে।

আমাদের দেশের এক বিখ্যাত কবি তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন, যদি কুমড়োর মতো চালে ধরে র'ত পান্তুয়া শত-শত···। তা হলে যে সেটা খুব মজার ব্যাপার হত, তাতে আর সন্দেহ কী। আমরা তা হলে প্রত্যেকেই আমাদের বাড়িতে, যে-ভাবে কুমড়োর চারা বসায়, সেইভাবে পান্তুয়া-গাছের চারা বসিয়ে দিতুম, তাই না ? কিন্তু সেটা তো আজগুবি কল্পনার ব্যাপার। আশ্চর্য ফল কিন্তু আজগুবি ব্যাপার নয়। তাই, একদিন হয়তো আমাদের দেশেও এর চাষ হবে। সে এক দারুণ কাণ্ড হবে, কী বলো ?

শেষ করার আগে অলৌকিক ফল সম্পর্কে একটি বিচিত্র তথ্য তোমাদের কাছে পেশ করব। বাঁদরদের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, অলৌকিক ফল ভক্ষণ করলেও তার কোনও প্রভাব ওদের ওপর একেবারেই পড়ে না। কাজেই একঝুড়ি অলৌকিক ফল খাওয়ার পরেও টক খাদ্যের স্বাদ বাঁদরদের কাছে টকই লাগবে। বাঁদর-সমাজের পক্ষে এটা নিঃসন্দেহে খুবই লোকসানের ব্যাপার !

শুরু হল শার্লক হোমসের নতুন গল্প

হলদে মুখ

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আমার বন্ধু শার্লক হোমসের কাজকর্মের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে আমি সেই ঘটনাগুলোই বেছে নিয়েছি, যেগুলোর ফয়সালা সে করতে পেরেছে। অবশ্য এর একটা বড় কারণ হল যে, শার্লক হোমস যে-সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, সে-সমস্যার সমাধান আর কেউই করতে পারেনি। সে-সমস্যা চিরকালের জন্যে সমস্যাই রয়ে গেছে। এই ঘটনাগুলোর কোনও-কোনওটা আমি তার কাছে শুনেছি, আর অনেকগুলোর সমাধানের সময় আমি তার সঙ্গে থেকেছি। তবে যেটা বরাবর লক্ষ করেছি সেটা হল, যখন শার্লক হোমস কোনও রহস্যের মোকাবিলা করতে পারছে না, তখন তার দক্ষতা, ক্ষমতা আর জেদ যেন দশগুণ বেড়ে যায়। আবার দু-একবার এমনও হয়েছে যে, শার্লক হোমস ভুল পথে এগিয়েও রহস্যের মোকাবিলা করে ফেলেছে। আমার ডায়েরিতে এই ধরনের গোটা-ছয়েক ঘটনার কথা লেখা আছে। তার মধ্যে দুটো ঘটনা খুবই ইন্টারেস্টিং। সেই দুটো ঘটনার একটা ঘটনা আজ লিখব বলে ঠিক করেছি।

স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য ব্যায়ামট্যায়াম করা শার্লক হোমসের ধাতে নেই। অথচ তার গায়ে জোর সাংঘাতিক। শুধু গায়ের জোরই নয়, বক্সিং-এও তার জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু কী জানি কেন, মুগুর ডাম্বেল ভাঁজা বা ডনবৈঠক দেওয়ার ব্যাপারটাকে হোমস সময় আর ক্ষমতার অপব্যবহার বলে মনে করে। তাই নেহাত তদন্তের ব্যাপার ছাড়া ঘর থেকে বেরোত না। আর যখন কোনও তদন্তের কাজে হাত দিত, তখন সে দিনরাত নাওয়া-খাওয়া ভুলে কাজ করত। তখন তাকে ক্লান্ত হয়ে জিরোতে দেখিনি কখনও। কী করে যে হোমস নিজেকে এমন 'ফিট্' রাখে, সেটা সত্যি একটা আশ্চর্যের কথা। অবশ্য একটা কারণ এই হতে পারে যে, খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে হোমস খুব সাবধানী। সে খায় খুব সামান্য। আর খায়ও সাদাসাপটা। আর একটা কারণ হতে পারে যে ধূমপান ছাড়া তার অন্য কোনও নেশা নেই।

শীত শেষ হয়ে বসন্ত আসি-আসি করছে। হোমস খুব খোশমেজাজে ছিল। আমাকে টেনে নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। আমরা পার্কে ঢুকলুম। সবে গাছে-গাছে কচিপাতা বেরোতে শুরু করেছে। প্রায় দু' ঘণ্টা আমরা চুপচাপ সেখানে বেড়াতে লাগলুম। তারপর আমরা যখন বেকার স্ট্রিটে ফিরে এলুম, তখন পাঁচটা বেজে গেছে।

আমরা ফিরে আসতেই আমাদের কাজের লোকটি বললে, "একজন ভদ্রলোক আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।"

হোমস আমার দিকে ভৎসনার দৃষ্টিতে তাকাল, "বিকেলে বেড়াতে যাওয়ার ফল হাতেনাতে পাওয়া গেল!" হোমস আমাকে কথা শুনিয়ে দিল। তারপর ছেলেটাকে বলল, "সে ভদ্রলোক কি চলে গেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কি তাঁকে ঘরে বসতে বলোনি?"

"বলেছিলুম। তিনি ঘরে বসেওছিলেন।"

"তিনি কতক্ষণ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন?"

"তা প্রায় আধঘণ্টা তো হবেই। তবে ভদ্রলোক খুব ছটফট করছিলেন। আমি তো বাইরে থেকে শুনতে পাচ্ছিলুম যে, ভদ্রলোক একবার বসছেন, একবার দাঁড়াচ্ছেন, একবার পায়চারি করছেন। তারপর এক সময় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উনি বললেন, 'ভদ্রলোক ঘরে ফিরবেন না নাকি?' ঠিক এই কথাগুলোই উনি বলেছিলেন। আমি বললুম, 'আপনি আর একটু বসুন। উনি এক্ষুনি এসে পড়বেন।' তখন ভদ্রলোক বললেন, 'তা হলে আমি বরং বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। ঘরের মধ্যে আমার হাঁফ ধরছে।' আমার কথায় কান না দিয়ে ভদ্রলোক তড়বড় করে নেমে গেলেন।"

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হোমস কাজের ছেলেটিকে বললে, "না, তোমার কোনও দোষ নেই," তারপর আমাকে বললে, "খুব বিরক্ত লাগছে। বুঝলে ওয়াটসন, মাথা খাটাবার মতো কোনও বিষয়ই আমার হাতে নেই। ভদ্রলোক যেরকম উত্তেজিত আর অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন, তার থেকে মনে হচ্ছে যে, তাঁর আমার কাছে আসবার কারণটা বেশ জরুরি।... আরে আরে, টেবিলের ওপর ওই পাইপটা তো তোমার নয়। নিশ্চয়ই সেই ভদ্রলোকই এই পাইপটা ফেলে গেছেন। দেখি তো। বেশ পুরনো ব্রায়ার পাইপ। বাজারে এগুলোকে বলে অ্যাম্বার। এ ধরনের খাঁটি অ্যাম্বার লন্ডন শহরে খুব বেশি আছে বলে আমার মনে হয় না। লোকে বলে খাঁটি অ্যাম্বারের মধ্যে একটা দাগ থাকে। নকল দাগ দিয়ে জাল অ্যাম্বার তৈরি করাটা একটা বড় ব্যবসা। যে-কোনও কারণেই হোক ভদ্রলোক মনে-মনে এতই বিচলিত হয়ে পড়েছেন যে, তাঁর এই প্রিয় পাইপটা এখানে ফেলে গেছেন।"

আমি বললুম, "পাইপটা যে ভদ্রলোকের প্রিয়, এ-কথাটা তুমি জানলে কেমন করে?"

"দ্যাখো ওয়াটসন, এই পাইপটার দাম হবে বড়জোর সাড়ে সাত শিলিং। আচ্ছা এইবার দ্যাখো, পাইপটাকে দু'বার মেরামত করা হয়েছে। একবার নলটা সারানো হয়েছে, আর একবার মুণ্ডিটা সারানো হয়েছে। দু' জায়গাতেই রুপোর পাত মেরে দেওয়া হয়েছে। এই এক-একটা রুপোর পাতের দাম পাইপটার দামের চাইতে বেশি। ভদ্রলোক এত খরচ করে দু-দুবার পাইপটা কখনও সারাতেন না, যদি এটার ওপর তাঁর বিশেষ টান না থাকত। এর চাইতে ঢের কম পয়সায় তিনি একটা নতুন পাইপ কিনে নিতে পারতেন।"

লক্ষ করলুম, হোমস পাইপটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে। তাই আমি বললুম, "এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারো?"

হোমস পাইপটা তুলে ধরলে। তারপর মেডিকেল কলেজে অধ্যাপকমশাইরা যেমন একটা হাড়ের টুকরোর ওপর আঙুল

দিয়ে দাগ টানতে টানতে বক্তৃতা দেন, সেইরকম ভাবে বলতে লাগল, "পাইপ থেকে একটি মানুষ সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারা যায়। ঘড়ি আর জুতোর ফিতের পরে পাইপই হচ্ছে একমাত্র জিনিস, যেটাকে খুঁটিয়ে দেখলে সেই মানুষটির স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে প্রায় সব কথাই জানা যায়। কিন্তু এই পাইপটায় সেরকম কোনও বিশেষত্ব চোখে পড়ছে না। এই পাইপের মালিকের স্বাস্থ্য বেশ ভাল। ভদ্রলোক ন্যাটা। তাঁর দাঁত খুব ভাল। স্বভাব অগোছালো। অবস্থা ভাল, হিসেব করে চলতে হয় না।"

হোমস কথাগুলো তরতর করে বলে গেল। তারপর আমার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি বুঝতে পারলুম, সে জানতে চাইছে যে, কোন্ তথ্যের ওপর নির্ভর করে সে এই কথাগুলো বলেছে তা আমি বুঝতে পেরেছি কি না।

"লোকটি সাড়ে সাত শিলিং দামের পাইপ ব্যবহার করছে বলে তুমি ধরে নিচ্ছ যে, তার অবস্থা ভাল," আমি বললুম।

পাইপটা থেকে ঠুকে-ঠুকে তামাক হাতের চেটোয় বের করে হোমস বললে, "এই তামাকের নাম গ্রোভনার মিক্সচার। এক আউন্সের দাম আট পেন্স। এর অর্ধেক দামে ভাল-ভাল তামাক পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও যখন উনি এই তামাকই ব্যবহার করেন, তখন বোঝা যাচ্ছে যে, ওঁর পয়সার টানাটানি নেই।"

"কিন্তু আর সব কথা তুমি জানলে কী ভাবে?"

"গ্যাস থেকে পাইপ ধরানো ভদ্রলোকের অভ্যেস। দ্যাখো, পাইপের মুণ্ডির পাশটা পুড়ে গেছে। দেশলাই দিয়ে পাইপ ধরালে এভাবে পুড়ত না। দেশলাইটা লোকে তামাকের ওপরে ধরে, পাইপের ধারে নয়। ধারটা পুড়তে পারে আগুনের ওপর ধরলে। তারপর দ্যাখো, পাইপের ডানদিকটাই বেশি পুড়েছে। এর কারণ হচ্ছে, ভদ্রলোক ন্যাটা। তুমি যদি তোমার পাইপটা ওইভাবে ধরাও তো দেখবে, বাঁ দিকটা পুড়বে। কেননা তুমি ন্যাটা নও। এক-আধবার তোমার ডান দিকটা পুড়তে পারে। তবে বেশি পুড়বে বাঁ দিকটা। তারপর দ্যাখো,অ্যাম্বারের ওপর ভদ্রলোকের দাঁতের দাগ বসে গেছে। পাইপকে এইভাবে কামড়ে ধরতে পারে সেই লোকই, যার গায়ে বেশ তাগত আছে, আর যার দাঁতও বেশ মজবুত। তবে আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তো ওই বোধহয় সিঁড়িতে ভদ্রলোকের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর, তা হলে পাইপ নয়, পাইপের মালিককেই আমরা দেখতে পাব।"

হোমসের কথা শেষ হতে-না-হতেই এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রলোক বেশ লম্বা। বয়েস কম। তাঁর জামাকাপড় দামি, তবে সাদাসিধে। তাঁর বাঁ হাতে একটা তামাটে রঙের ফেল্ট হ্যাট। আমার মনে হয়েছিল ভদ্রলোকের বয়েস তিরিশের কমই হবে। পরে জানতে পেরেছিলুম যে, ভদ্রলোকের বয়েস তিরিশের ঢের বেশি।

ঘরে পা দিয়েই ভদ্রলোক বেশ লজ্জিতভাবে বললেন, "আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি না-বলেকয়েই ঘরে ঢুকে পড়েছি। আমার উচিত ছিল দরজায় টোকা দিয়ে আপনাদের জানিয়ে ঘরে ঢোকা। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার মাথার ঠিক নেই। আর তাই আমি এরকম অসভ্যের মতো ঢুকে পড়েছি।" তারপর ভদ্রলোক কপাল চাপড়াতে-চাপড়াতে

চেয়ারে বসে পড়লেন। লিখছি বটে বসলেন, তবে আমার মনে হল তিনি যেন চেয়ারের ওপর ধপ করে পড়ে গেলেন।

হোমস তার স্বভাব-সুলভ সহজ ভঙ্গিতে বললে, "বুঝতে পারছি আপনি দু-এক রাত জেগেই কাটিয়েছেন। রাত্তিরে ঘুম না হলে আমাদের শরীরে যত ধকল হয় তা বেশি খাটাখাটনি করলে বা হৈ-হুল্লোড় করে মাতামাতি করলেও হয় না। বলুন তো, আমি কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।"

"আমি আপনার পরামর্শ চাই। কী যে করব কিছুই ঠিক করতে পারছি না। মনে হচ্ছে আমার বোধহয় সব শেষ হয়ে গেল।"

"আপনি কি চান যে, আমি একজন গোয়েন্দা হিসেবেই আপনাকে পরামর্শ দিই?"

"না, না, তা নয়। একজন বিবেচক মানুষ হিসেবে আপনার মত জানতে চাইছি। কী করব আমি। আপনি আমাকে বলে দিন আমার কী করা উচিত। ঠিক পথের হদিস পাব বলেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।"

ভদ্রলোকের কথা বলার ধরনটা লক্ষ করছিলুম। খানিকক্ষণ কথা বলেই তিনি চুপ করে যাচ্ছিলেন। আবার দু-একটা কথা বলে ফের চুপ করছিলেন। আমি বুঝতে পারছিলুম যে, খুব দুঃখের সঙ্গেই তিনি কথাগুলো বলছিলেন। আর কথাগুলো বলতে তাঁর মোটেই ইচ্ছে করছিল না।

ভদ্রলোক বলছিলেন, "ব্যাপারটা মানে খুবই ইয়ে আর কি। ঘরের কথা বাইরে কে বলতে চায় বলুন? দেখুন না, আপনাদের সঙ্গে আমার আজই পরিচয় হল। আপনাদের কাছে বাড়ির লোকের কাণ্ডকারখানা বলাটা আমার পক্ষে কতখানি দুঃখের।...কিন্তু আমি যে আর পারছি না। আমি আমার ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছি। আমাকে কারও পরামর্শ নিতেই হবে।"

ভদ্রলোককে বাধা দিয়ে হোমস বললে, "মিঃ গ্রান্ট মনরো..."

ভদ্রলোক তড়াক করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন, "আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?"

হোমস মুচকি হেসে বললে, "আপনি যদি নিজের নামধাম গোপন রেখে কোনও কাজ করতে চান তো টুপির পট্টিতে

নিজের নাম লিখে রাখবেন না। আর নয় তো এমনভাবে বসে কথা বলবেন যে, যার সঙ্গে কথা বলছেন, সে যেন আপনার চাঁদি ছাড়া আর মাথার অন্য কোনও দিক দেখতে না পায়। সে কথা থাক। আমি আপনাকে যা বলছিলুম তা হল এই যে, এই ঘরে অনেক লোক এসে তাদের মনের দুঃখের কথা আমাদের বলেছে। ভগবানের দয়ায় তাদের অনেকের মনের কষ্ট আমরা দূর করতে পেরেছি। আমি আশা করি, আপনার মনের কষ্টও আমরা দূর করতে পারব। আর সেইজন্য আমি আপনাকে বলছি যে, আর কথা না বাড়িয়ে আপনার সমস্যার সব কিছু আমাকে খুলে বলুন। সব কথা কিন্তু আমার জানা দরকার।"

আমাদের মক্কেল বেশ কিছুক্ষণ দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপচাপ বসে রইলেন। ভদ্রলোকের হাবভাব দেখে আমার মনে হল যে, ইনি খুবই মুখচোরা ধরনের লোক, আড়ালে-আড়ালে থাকতেই ভালবাসেন। নিজের কথা কাউকে বলতে চান না। এখন বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে বলে মুশকিলে পড়েছেন। এইভাবে বেশ খানিকক্ষণ বসে থেকে একসময় তিনি বলতে লাগলেন, "ব্যাপারটা হচ্ছে এই। বছর তিনেক আগে আমার বিয়ে হয়েছে। আমরা স্বামী-স্ত্রী বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই ছিলুম। আমাদের মধ্যে কোনও ব্যাপারে কথা-কাটাকাটি বা ঝগড়াঝাঁটি হয়নি। হঠাৎ গত সোমবার থেকে আমার স্ত্রী, এফির কী যে হয়েছে বলতে পারি না, একদম বদলে গেছেন। তাঁর হাবভাব, আচার-আচরণ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এ যেন একজন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। আর কেন যে তিনি হঠাৎ এরকম পালটে গেলেন তা আমি কিছুতেই ধরতে পারছি না।

"তবে একটা কথা গোড়াতেই আপনাকে পরিষ্কার করে বলা ভাল। এফি অত্যন্ত ভদ্র, নম্র, স্নেহপ্রবণ, সুশীল প্রকৃতির মেয়ে। তাঁর মতো স্বভাব-চরিত্রের মেয়ে আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। সবচেয়ে বড় কথা যে, তাঁর শারীরিক বা মানসিক কোনও অসুখই নেই। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস..."

ভদ্রলোক হয়তো আরও কিছু বলতেন, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে শার্লক হোমস বললে, "আপনার বিশ্বাসের কথা পরে শুনব। আগে ফ্যাক্টস, মানে যা যা ঘটেছে, সেগুলো আমাকে বলুন।"

"আচ্ছা, তা হলে আগে এফির কথাই আপনাকে বলি। এফির সঙ্গে আমার যখন আলাপ হয়, তখন তাঁর নাম ছিল মিসেস এফি হেব্রোন। খুব অল্প বয়সে আমেরিকান আইনজীবী মিঃ হেব্রোনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তিনি আমেরিকায় ওকালতি করতেন। পসারও ছিল খুব। আটলান্টা শহরে ওঁরা থাকতেন। ওঁদের একটি ছেলেও হয়েছিল। হঠাৎ আটলান্টা শহরে 'ইয়েলো ফিভার' দেখা দেয়। আর অল্প দিনের মধ্যেই সেটা মহামারীর আকার নেয়। ইয়েলো ফিভারে মিঃ হেব্রোন আর ছেলেটি মারা যায়। আমি তাঁদের সরকারি ডেথ সার্টিফিকেট দেখেছি। এই ঘটনার পর এফির আর আমেরিকায় মন টেঁকেনি। তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। মিডলসেক্সের পিনারে এফির এক বুড়ি পিসি থাকেন। তিনি বিয়ে করেননি। এফি তাঁর কাছে চলে আসেন। আগেই বলেছি, মিঃ হেব্রোনের বেশ ভাল পসারই ছিল। তাই তিনি এফির জন্যে ভালরকম টাকা-পয়সারই ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। সাড়ে চার হাজার পাউন্ড এফির নামে এমন ব্যবস্থা করা আছে যে, তার থেকে কম পক্ষে শতকরা ৭ পাউন্ড সুদ তিনি পাবেনই। এফির সঙ্গে আমার আলাপ হয় পিনারে। তার বেশ কিছুদিন আগে তিনি আমেরিকা থেকে চলে এসেছেন। তখন তাঁর বয়েস পঁচিশ বছর।

"আমি একজন ব্যবসাদার। আমার আয় মোটামুটি সাত-আটশো পাউন্ড। আমাদের অবস্থা বেশ ভালই। আমরা নরবেরিতে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছি। শহরের খুব কাছে হলেও নরবেরি অঞ্চলটা বেশ পাড়া-গাঁ পাড়া-গাঁ। আমাদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে একটা ছোট হোটেল আর দুটো বাড়ি আছে। আমাদের বাড়ির সামনে একটা বড় মাঠ। মাঠের উলটো দিকে একটা বাড়ি। এ ছাড়া আমাদের বাড়ির কাছে আর কোনও বাড়ি নেই। লোকালয় বলতে আর যা তা আমাদের বাড়ি থেকে স্টেশনে যাবার অর্ধেক পথে। কাজের জন্যে আমাকে প্রায়ই লন্ডনে যেতে হয়। তবে গরমকালে কাজের চাপটা সাধারণত কম থাকে। তাই আমরা সেই সময়ে বেশ স্ফূর্তিতেই ঘরে দিন কাটাই।

"একটা কথা আপনাদের বলা দরকার। আমাদের যখন বিয়ে হয়, তখন আমার স্ত্রী তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি আমার নামে লিখে দেন। আমি অনেক আপত্তি করেছিলুম। কেননা আমার ভয় ছিল যে, ব্যবসায় লোকসান হলে ব্যাপারটা আমার পক্ষে খুব খারাপ হবে। কিন্তু তিনি রাজি হননি। শেষকালে তাঁর কথামতোই ব্যবস্থা হল। যাক সে কথা। আজ থেকে মাস-দেড়েক আগে একদিন এফি আমার কাছে এসে বললেন, 'তুমি যখন আমার টাকা নিতে রাজি হয়েছিলে তখন বলেছিলে যে, আমার দরকার পড়লে আমি তোমার কাছ থেকে টাকা নিতে পারব।'

"'নিশ্চয়ই। এ তো তোমারই টাকা,' আমি জবাব দিলুম।

"'বেশ। তা হলে আমাকে একশো পাউন্ড দাও।'

"এফির কথায় আমি বেশ অবাক হয়ে গেলুম। আমি ভেবেছিলুম যে, তিনি বোধহয় কোনও নতুন জামাকাপড় কিনবেন।

"'এত টাকার কী দরকার হল,' আমি না জিজ্ঞেস করে পারলুম না।

"একটু রসিকতা করে এফি বললেন, 'তখন তুমি বলেছিলে যে, তুমি আমার ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে গেলে কৈফিয়ত দিতে হয় বুঝি?'

"'তুমি যদি জিনিসটা এভাবে দ্যাখো, তা হলে কোনও কথা বলা চলে না। টাকাটা তুমি পাবে।'

"'হ্যাঁ, টাকাটা আমার চাই।'

"'কী জন্যে টাকাটা তোমার চাই, তা তুমি আমাকে বলবে না?'

"'পরে বলব। তবে এখন বলা যাবে না।'

"'ঠিক আছে।'

"আমি আর কিছু না বলে এফিকে একটা একশো পাউন্ডের চেক লিখে দিলুম। ব্যাপারটা আমি একসময় একদম ভুলেই গিয়েছিলুম। এর পরের ঘটনার সঙ্গে এ-ব্যাপারটার হয়তো কোনও যোগ নেই। তবে আমার মনে হল সব কিছু আপনাকে খুলে বলাই ভাল।" (ক্রমশ)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে পঞ্চানন্দ জানায়, সে তাঁর স্বর্গত পিতা উদ্ভটবিজ্ঞানী শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। সে নাকি তাঁর শাকরেদ ছিল। হরিবাবুকে সে একটা পুরনো চাবি দিয়ে বলে, "ঈশান কোণ, তিন ক্রোশ।" হরিবাবুর ছোট ভাই ন্যাড়া কুস্তি শেখে গজ-পালোয়ানের কাছে। আর এক ভাই জরিবাবু শেখেন কালোয়াতি গান। হরিবাবুর দুই ছেলে ঘড়ি ও আংটির খেলা দেখে যে-মহারাজা তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন, বাসের মধ্যে খুন হয় তাঁর সেক্রেটারি। গজ'র ডেরা চক-সাহেবের পোড়োবাড়িতে ঢুকে যে-লোক মারা যায়, তার লাশ মেলেনি। সেক্রেটারির লাশও বেপাত্তা। মধ্যরাতে শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে মূল্যবান কিছুর খোঁজে ঢুকেছিল গজ ; তিন অতিকায় মূর্তি তাকে বন্দী করে। চক-সাহেবের বাড়িতে উঁকি মেরে পঞ্চানন্দ যাকে দেখতে পায়, তার ক্ষমতা সীমাহীন। হরিবাবু ছাতে উঠে নীল চাঁদ দেখে কবিতা লেখেন। পঞ্চানন্দ বলে সেটা উড়ন্ত চাকি। চক-সাহেবের বাড়িতে যাবার পথে সে আক্রান্ত হয়। ঢ্যাঙা আততায়ীকে ঘায়েল করে সেই তিনটে অতিকায় লোক, গজকে যারা আটকে রেখেছে। বিদ্যুতের বেড়া অপসৃত হয়েছে বুঝে এগিয়ে যেতেই কাঁকড়াবিছের কামড় খায় গজ, তারপর খানিক হেঁটে এক জলায় বেহুঁশ পড়ে যায়। জ্ঞান ফিরে পেয়ে পঞ্চানন্দও খানিক এগিয়ে গজ'র খোঁজ পায়। কিন্তু গজ'র ছিপছিপে শরীর ইতিমধ্যে হাতির মতন হয়ে গেছে। উড়ন্ত চাকি দেখে ঘড়ি আর আংটিও বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। চক-সাহেবের বাড়িতে ঢুকে আংটি ঘুম লাগায়। ঘড়ি যে কাঁকড়াবিছেটাকে জুতোর তলায় চেপে ধরে, সেটা যান্ত্রিক। এদিকে আংটি সন্ধান পায় প্রথমে সেই মহারাজার 'মৃত' সেক্রেটারির, পরে স্বয়ং মহারাজার। মহারাজা বলেন, অন্য নক্ষত্র-**মণ্ডলের** লোকেরা পৃথিবীকে চুরি করতে চায়। হরিবাবু ইতিমধ্যে ল্যাবরেটরিতে একটা গোলকের খোঁজ পেয়েছেন। আর আংটি জেনেছে, মহারাজা আর কেউ নন, ভিন্ন গ্রহের মহাশক্তিধর রামরাহা। গোলক-হাতে বেরিয়ে হরিবাবু ইতিমধ্যে ভিন্-গ্রহের মানুষদের জাহাজে বন্দী হন। সেখানে তাঁর পরিচিত অনেকেও আছেন। রামরাহা ওদিকে ঘড়িকে জানান যে, শক্তির উৎস রয়েছে শত্রুদের জাহাজে। তারপর...

রামরাহা আংটির পিঠে তার সবল হাতখানা রেখে বলল, "তোমাদের তেমন যন্ত্রপাতি বা অস্ত্রশস্ত্র নেই বটে, কিন্তু দারুণ সাহস আছে। তোমাদের মতো আমাদের মা, বাবা, ভাইবোন নেই, কাকা মামার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের গ্রহমণ্ডলে ওসব সম্পর্কই নেই। জন্মের পর থেকেই আমরা স্বাধীন। তাই কারও জন্য কোনও পরোয়াও নেই। যাদের জন্য তুমি নিজে মরতে চাইছ, আমি হলে তাদের জন্য এক সেকেণ্ডও চিন্তা করতাম না। সন্দেহ নেই তোমরা খুব সেকেলে, খুব আদিমযুগে পড়ে আছ এখনও। তবু এইজন্যই তোমাদের ভাল লাগে আমার।"

আংটি ছলোছলো চোখে বলল, "মা, বাবা, দাদা, কাকাদের ভীষণ ভালবাসি যে।"

রামরাহা মাথা নেড়ে বলল, "আমরা ভালবাসা কাকে বলে জানিই না। আমরা শুধু কাজ করতে জানি, যুদ্ধ করতে জানি, ফসল ফলাতে জানি, যন্ত্রবিদ্যা জানি। আমাদের সঙ্গে যন্ত্রের খুব একটা তফাত যে নেই, তা এই পৃথিবীতে এবং বিশেষ করে তোমাদের এই পুবদিকের দেশে এসে বুঝেছি। তোমাদের কাছে এসে মনে হচ্ছে আমরা কী বিশ্রী জীবনই না যাপন করি।" বলতে বলতে রামরাহা একটা দূরবিনের মতো জিনিস চোখে এঁটে জলার দিকে তাকালেন। তারপর সামান্য উত্তেজিত গলায় বললেন, "আরে, ওরা যে একটা লোককে ওদের যানে তুলে নিয়েছে!"

আংটি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে রামরাহার হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে চোখে লাগাল। এবং বায়োস্কোপের ছবির মতো দেখতে পেল, একটা বিকট দানব জলা থেকে একজন মানুষকে ধরে নিয়ে ভিতরে চলে যাচ্ছে। সবচেয়ে ভয়ংকর কথা, মানুষটা তার বাবা।

আংটি কোনও আর্তনাদ করল না। যন্ত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে হরিণের মতো টগবগে পায়ে জলার জলে নেমে ছুটতে লাগল। রাগে আর আতঙ্কে সে দিশেহারা। বুদ্ধি স্থির নেই।

বিশাল পটলের মতো মহাকাশযানটার কাছাকাছি পৌঁছতেই পথ আটকাল তার চেয়ে দশগুণ বড় দশাসই একটা দানব। আংটি বিন্দুমাত্র না ভেবে লাফিয়ে গিয়ে জোড়া পায়ে দানবটার পেটে লাথি কষাল, তারপর এলোপাথাড়ি কিল চড় ঘুসি ক্যারাটের মার—কিছুই বাদ রাখল না।

আশ্চর্যের বিষয় তার মতো খুদে মানুষের ওই তীব্র আক্রমণে দানবটা আধ মিনিট যেন হতভম্ব হয়ে গেল। একবার গোঙানির মতো যন্ত্রণার শব্দও করল একটা। কিন্তু সেটা আর কতক্ষণ? আংটির লড়াই করার ক্ষমতা আর কতটুকুই বা। দানবটা তার বিশাল হাতে আংটির ঘাড়টা ধরে শূন্যে ভাসিয়ে নিয়ে ঠিক তার বাবার মতোই মহাকাশযানের ভিতরে চৌকো ঘরটায় ফেলে দিল। আংটির তেমন লাগল না। লাফঝাঁফে তার অভ্যাস আছে। সে ঘরের চারদিকে তার বাবাকে খুঁজতে লাগল।

"বাবা!"

হরিবাবু খুবই অবাক হয়ে গেলেন আংটিকে দেখে। তারপর হাত বাড়িয়ে ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "তুই কোত্থেকে এলি?"

"বাবা! আমাদের ভীষণ বিপদ।"

হরিবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "সে তো বুঝতেই পারছি। যখন জাহাজের সঙ্গে মিল দেওয়ার মতো একটাও শব্দ খুঁজে পেলাম না, তখনই বুঝলাম আমাদের খুব বিপদ ঘটেছে নিশ্চয়ই, তা আর কী করা যাবে, তোদের দুই ভাইয়ের জন্য একটা ক্রিকেট বল রেখেছি। এই নে। বাবার ল্যাবরেটরিতে পেলাম। ভাবলাম তোরা খুব খেলা-টেলা ভালবাসিস, তোদের কাজে লাগবে হয়তো।"

আংটি গোল বস্তুটা হাতে নিয়ে বলল, "কিন্তু বাবা, এ তো ক্রিকেট-বল নয়।"

"তবে এটা কী?"

জিনিসটা হাতে তুলে নিয়ে দেখল আংটি। বেশ ভারী কোনও ধাতু দিয়ে তৈরি। গায়ে খুদে-খুদে বোতামের মতো কী

সব রয়েছে। আংটির বুকটা গুড়গুড় করে উঠল। রামরাহা যে জিনিসটার কথা বলেছে, এটা সেটা নয় তো! দাদুর ল্যাবরেটরিতে যখন পাওয়া গেছে, তখন সেটাই হতে পারে। কিন্তু এই বস্তু দিয়ে কী করা যায় তা তো আংটি জানে না। সে জিনিসটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে-দেখতে হঠাৎ চোখ পড়ল একটা বোতামের ওপর।

আংটি বোতামটায় হালকা আঙুলে একটু চাপ দিল। কিছুই ঘটল না। আংটি আর একটু জোরে চাপ দিল। কিছুই ঘটল না এবারও।

আংটি একটু ভেবে নিল। তারপর তার শরীরের সমস্ত শক্তি আঙুলে জড়ো করে প্রাণপণে বোতামটা চেপে ধরল।

***

ঘড়ি আর পঞ্চানন্দ সবই দেখছিল। তবে আবছা ভাবে।

ঘড়ি মুখ চুন করে বলল, "ওরা বাবাকে ধরেছে, আংটিকেও ধরল, এবার কী করা যায় বলুন তো!"

পঞ্চানন্দ ভয়-খাওয়া মুখে বলল, "আমার মাথায় কিছু খেলছে না। তবে আংটি বড্ড বোকার মতো তেড়েফুঁড়ে গিয়ে বিপাকে পড়ে গেল। একটু বুদ্ধি খাটালে কাজ দিত।"

ঘড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "কিন্তু বুদ্ধি তো মাথায় খেলছে না।"

পঞ্চানন্দও ঘড়ির দেখাদেখি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "আমার মাথাটা পেটের সঙ্গে বাঁধা। পেট ফাঁকা থাকলে মাথাটাও ফাঁকা হয়ে যায়। আর পেট ভরা থাকলে মাথাটাও নানারকম বুদ্ধি আর ফিকিরে ভরে ওঠে। অনেকক্ষণ কিছু খাইনি তো।"

পঞ্চানন্দ কথাটা ভাল করে শেষ করার আগেই তার ঘাড়ে ফঁত করে একটা শ্বাস এসে পড়ল। শ্বাস তো নয়, যেন ঘূর্ণিঝড়। পঞ্চানন্দ একটু শিউরে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে যা দেখল তাতে তার বাক্য সরল না। সে হাঁ হয়ে রইল।

ঘড়ি নিবিষ্টমনে জলার মধ্যে দানবদের চলাফেরা লক্ষ করছিল। এক্ষুনি একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু এই প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্বল মানুষের কীই বা করার আছে! আচমকা সেও পিছন দিকে একটা কিছুর অস্তিত্ব টের পেল। বিদ্যুৎবেগে ঘাড় ঘুরিয়ে সেও যা দেখল তাতে আঁতকে ওঠারই কথা।

পিছনে বিকট এক চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গজ-পালোয়ান। দু'খানা চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। ফুলে-ওঠা শরীরটা যেন খুনখারাপির জন্য উদ্যত হয়ে আছে। হাতের আঙুলগুলো আঁকশির মতো বাঁকা।

ঘড়ি ঘুসি তুলেছিল, কিন্তু সেটা চালাল না। চাপা স্বরে বলল, "গজদা!"

গজ তার দিকে তাকাল। তারপর একটু ভাঙা-গলায় বলল, "তোরা এখানে কী করছিস?"

গজ যে মাতৃভাষায় স্বাভাবিকভাবে কথা বলবে, এটা ঘড়ি আশা করেনি। সে মনে-মনে ধরে নিয়েছিল, গজ-পালোয়ানও ওই বর্বর দানবদের একজন হয়ে গেছে। কিন্তু তা হয়নি দেখে সে স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে বলল, "ওই দ্যাখো গজদা, জলার মধ্যে কী সব কাণ্ড হচ্ছে!"

গজ গম্ভীর মুখে বলল, "দেখেছি, আমাকে ওরাই আটকে রেখেছিল ওই গুহায়।"

ঘড়ি আকুল হয়ে বলল, "এখন আমরা কী করব গজদা?"

"তোদের কিছু করতে হবে না। আমিই যা করার করছি।"

এই বলে গজ-পালোয়ান নিঃশব্দে জলে নেমে গেল। ওই বিশাল দেহ নিয়ে যে কেউ এত সাবলীল চলাফেরা করতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

ঘড়িও টপ করে উঠে পড়ল। কিছু একটা করতে হবে। নইলে সাঙ্ঘাতিক একটা বিপদ ঘটবে। আর একটা কিছু করার এই সুযোগ। সে গজর পিছনে পিছনে এগোতে গিয়ে টের পেল, পঞ্চানন্দও জলে নেমে পড়েছে।

গজর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অবশ্য তারা পেরে উঠছিল না। গজ এগিয়ে যাচ্ছে মোটর-লঞ্চের মতো তীব্রবেগে। ঘড়ি আর পঞ্চানন্দ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জল ভেঙে এগোতে লাগল।

***

রামরাহা আংটির আকস্মিক প্রস্থানে একটু থমকে গিয়েছিল। তারপর সে আপনমনে একটু হাসল। স্মিত হাসি। যে জগৎ থেকে সে এসেছে সেখানে কেউ আবেগ বা ভালবাসা দিয়ে চালিত হয় না। তারা চলে হিসেব কষে। প্রতি পদক্ষেপই তাদের মাপা। কিন্তু এই পুরনো আমলের গ্রহটিতে মানুষজনের আচার-ব্যবহার সে যত দেখছে তত ভাল লাগছে। তত এরা আকর্ষণ করছে তাকে।

রামরাহা নিজের মহাকাশযানে ফিরে যাবে বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু এখন তার মনে হল, পৃথিবীর অসহায় এইসব মানুষজনকে বাঁচানোর একটা শেষ চেষ্টা করলে মন্দ হয় না।

রামরাহা ঘাড় ঘুরিয়ে অন্ধকারের দিকে চেয়ে চাপা গলায় বলল, "মাথুস, আমার বি মিটারটা নিয়ে এসো।"

সেই সুড়ুঙ্গে লম্বা লোকটা অন্ধকার ফুঁড়ে এগিয়ে এল। হাতে একটা খুব ছোট্ট থার্মোমিটারের মতো জিনিস।

রামরাহা কোমর থেকে বেল্টটা খুলে তার একটা সকেটে মিটারটা ঢুকিয়ে দিল। তারপর বেল্টটা কোমরে পরে নিয়ে সে জলের দিকে পা বাড়াল।

আশ্চর্যের বিষয় জলের দু'ইঞ্চি ওপরে যেন একটা অদৃশ্য কুশনে তার পা পড়ল। তারপর অনায়াসে জলের ওপর দিয়ে সে হাঁটতে লাগল।

হাতের মিটারটার দিকে বারবার চাইছিল রামরাহা। নানারকম আলোর সঙ্কেত ভেসে উঠছে। একটা আলোর রেখা বারবার ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

আচমকা আলোর রেখাটা একটা পাক খেয়ে বৃত্ত রচনা করল।

রামরাহা থমকে দাঁড়াল। এরকম হওয়ার কথা নয়। অজানা এক শক্তির উৎস কেউ ব্যবহার করছে। যদি যন্ত্রটা সক্রিয় হয়ে ওঠে, তবে পৃথিবীর সর্বত্র সবরকম শক্তির উৎস কিছুক্ষণের জন্য অকেজো হয়ে যাবে। বিজলি উৎপন্ন হবে না। পারমাণবিক সংঘাত একরত্তি তাপ দেবে না, থেমে যাবে বেশিরভাগ রি-অ্যাকটর।

রামরাহা ভাবতে লাগল, বর্বররা যদি যন্ত্রটার সন্ধান পেয়েই থাকে তবে তারা এত বোকা নয় যে, এই মোক্ষম সময়ে সেটা ব্যবহার করবে।

তবে? তা হলে?

যন্ত্রটা কে ব্যবহার করছে?

(ক্রমশ)

খেলার জগতের নানান তথ্যে সমৃদ্ধ

ভারতে বিজয় ও রমেশের পর টেনিসের ভবিষ্যৎ কি ? বুলা চৌধুরীকে নিয়ে প্রখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান সুইমিং কোচ্ আরনল্ডের এত আগ্রহ, অথচ আমাদের নিজের দেশের সুইমিং ফেডারেশন কেন উদাসীন ? উষা কি সত্যিই ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের আকাশে প্রথম উষার আলো ?
খেলাধূলা সম্পর্কিত এ রকম হাজারও প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে 'দেশ'-এর 'খেলা'-র পাতায় ।
'দেশ'-এর অবশ্য এছাড়াও নানান অঙ্গ রয়েছে । জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি, সাহিত্য, ভ্রমণ, কলাশিল্প, সাক্ষাৎকার—যে কোন দিক থেকেই দেখা যাক না কেন 'দেশ' এক পূর্ণাঙ্গ পত্রিকা ।
আর আজ বিশেষ করে 'দেশ'-এর প্রতিটি সংখ্যায় রয়েছে নতুন প্রতিশ্রুতি । এর প্রচ্ছদপটে সমসাময়িক কালের যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সার্থক প্রতিফলন । এর অঙ্গসজ্জায় ও মুদ্রণে রয়েছে ঔজ্জ্বল্য ও সমকালীনতার চিহ্ন ।
বাস্তবিকই, মনের জানালা খুলে দেওয়ার মত পত্রিকা একটিই, 'দেশ' ।

দেশ

চিন্তার জগতে বাঙলার ও বাঙালীর গৌরব

বড়গল্প

ছোটমামার গোয়েন্দাগিরি

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

সেবার ছোটমামা এলেন বেশ অনেকদিন পর। আমরা হৈ-হৈ করে ওঁকে চেপে ধরে বললাম, "গল্প বলো ছোটমামা।" আমরা সবাই জানি, ওঁর ভাঁড়ারে গল্পের স্টক অনেক।

মা ওঁকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, "অনেক দিন পর এলি বিরু। তার মানে গুজরাতে তোর মন বসে গেছে। এবার ভবঘুরেমিটা ছেড়ে একটু থিতু হ দেখি।"

ছোটমামা বললেন, "ছোড়দি, জন্মাবার ক্ষণে বিধাতাপুরুষ যা কপালে লিখেছেন, তা এড়াবার জো নেই কারও। কোনও একটা কিছু নিয়ে থিতু হওয়া আমার কপালে লেখা নেই, বুঝলে? তবে গুজরাত হচ্ছে এমন একখানা স্টেট, যাতে কাজের কমতি নেই। ভাল না লাগলে একটা ছাড়লে অন্যটা পাওয়া যায়। আর দেখার জিনিসও অনেক আছে ওখানে। কাজেই আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। তা বুলি, হাঁ করে কী দেখছিস, চা কর।"

চা নিয়ে এসে দেখি, ছোটমামা ওঁর কাঁধের ঝোলানো ব্যাগ থেকে সবার জন্য টুকটাক উপহার বার করছেন। মা'র জন্য গুজরাতি এমব্রয়ডারি করা কাঁচ-বসানো বটুয়া, বাবার জন্য আবুপাহাড়ের পাথরে তৈরি পেন স্ট্যাণ্ড, ভাইদের জন্য বুকে-ড্রাগন-আঁকা টি-শার্ট, ছোট বোনের জন্য একটা ডলপুতুল, বোধহয় নিউ মার্কেট থেকে কেনা। তারপর 'বুলি, এটা তোর জন্য' বলে কাগজে মোড়া একটা চৌকোমতন বাক্স আমায় দিলেন।

খুলে দেখি, একটা কাঠের বাক্স। ঢাকনাটায় খোদাই করা অপূর্ব কারুকার্য। মুগ্ধ হয়ে বললাম, "কী সুন্দর। মা, এটাতে আমার কস্ট্যুম জুয়েলারি রাখব, কেমন? থ্যাংক ইউ ছোটমামা।"

মা'ও বললেন, "জিনিসটা সত্যিই সুন্দর।"

"ওটার পেছনে একটা গল্পও আছে..."

"ওমা, তাই নাকি, তা হলে তো গল্পটা বলতেই হবে ছোটমামা!" আমরা সবাই চেপে ধরলাম।

"বলছি। কিন্তু তার আগে আর এক কাপ চা খাওয়া দেখি। আগের চা-টা কেমন যেন পানসে-পানসে লাগল।"

কড়া করে এক কাপ চা তৈরি করে নিয়ে এলাম। ইজিচেয়ারটায় আরাম করে টানটান হয়ে শুয়ে গল্প শুরু করলেন ছোটমামা, "মাঝখানে ছেড়ে দিলেও ইদানীং গ্রেট শিলিগুড়ি টি কোম্পানির চায়ের এজেন্সিটা ফের ধরেছিলাম। গুজরাতে 'বাঘ-মার্কা' চা খুব চলে। লোকাল কোম্পানির তৈরি। আমার পরামর্শমতো গ্রেট শিলিগুড়ি টি কোম্পানি সিংহমার্কা চা গুজরাতের বাজারে ছাড়তে লাগল এবং অল্প দিনের মধ্যেই বেশ পপুলার হয়ে গেল।"

আমি বললাম, "সিংহ তো পশুর রাজা। বাঘকে হারাবে এতে আর আশ্চর্য কী!"

"তা সত্যি," বললেন ছোটমামা, "কিন্তু গল্প বলার সময় ফোড়ন কাটিসনে। তাতে ফ্লো কমে যায়।"

"স্যরি, ছোটমামা।"

ছোটমামা ফের শুরু করলেন, "সিংহ-মার্কা চা পপুলার হওয়ার ফল হল যে, বেশির ভাগ চা'ই আমার কোনও চেষ্টা ছাড়াই বিক্রি হয়ে যেতে লাগল। লোকে বাড়ি বয়ে এসে অর্ডার দিয়ে যেত। খালি দু-চারটে বড় দোকানে আমি মাঝে-মাঝে যেতাম। এইরকম একটা বড় দোকানেই মুকেশভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হল আমার। চা কিনতে এসে উনি ব্রুকবণ্ড লিপটনের মধ্যে দোনামনা করছেন। আমি সিংহ-মার্কা চায়ের কথা বলায় মাথা নাড়লেন। অনামা কোম্পানির চা কিনে টাকা জলে ফেলতে রাজি নন উনি।

"ততক্ষণে দোকানদার ওঁর পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন। মুকেশভাই প্যাটেল বিরাট ধনী। বম্বেতে থাকতেন, ওখানকার শেয়ারমার্কেটে অনেক টাকা করেছেন। তবে সম্প্রতি স্থির করেছেন নিজের দেশ আমেদাবাদেই থাকবেন। বাড়িও কিনেছেন একটা। তবে একাই থাকেন। ফ্যামিলি এখনও বম্বেতে। 'ব্যাপার হচ্ছে,' বললেন মুকেশভাই, 'আমার মিসেস ব্রুকবণ্ডের চা কিনতেন, না লিপটনের, মনে করতে পারছি না। তবে এ-দুটো ব্র্যাণ্ডের একটা হবে।'

"গুজরাতে থেকে-থেকে আমারও ব্যবসা-বুদ্ধি পেকে গেছে। এক প্যাকেট সিংহ-চা ওঁর হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, 'নিন না ব্রুকবণ্ড বা লিপটন যা আপনার ইচ্ছে। কিন্তু এই প্যাকেটটা আমার উপহার। দয়া করে একটু টেস্ট করে দেখবেন। আর এই যে আমার কার্ড।'

"আমার ব্যবসাবুদ্ধি যে ভুল চাল দেয়নি, তার প্রমাণ পেলাম পরদিন সকালেই। ছুটির দিন, দেরি করে উঠেছি। নিজেই স্টোভ জ্বেলে চা তৈরি করে পেয়ালাটা নিয়ে সবে বসেছি, এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল।

"তুলে দেখি মুকেশভাই। 'মিঃ বীরেশ্বর, আপনার সিংহ-মার্কা চা সকালে খেলাম। আমার তো খুব ভাল লাগল। দামও দেখলাম, লিপটন ব্রুকবণ্ডের চেয়ে কম। ভাবছি, আপনার চা'টা কিনলেই হত।'

"মনের খুশি চেপে বললাম, 'তাতে কী, পরের বার কিনবেন।'

"'আচ্ছা, আপনার কাছ থেকে যদি ডিরেক্ট নিই, তা হলে ডিলারস্ ডিসকাউন্টটা পাব তো?'

"'নিশ্চয়।' মনে-মনে ভাবলাম, অমন ব্যবসা-বুদ্ধি না থাকলে আর এত টাকা করেছেন ভদ্রলোক!

"এর ক'দিন পরই মুকেশভাইয়ের ফোন পেয়ে পাঁচ পাউণ্ড চা নিয়ে ওঁর বাড়ি গেলাম। ডিসকাউন্টের অঙ্কটা দেখে উনি খুব খুশি। আমাকে বললেন, লাঞ্চ খেয়ে যেতে। আমার তো স্বপাকে খাওয়া। তাই কেউ খেতে বললেই তক্ষুনি রাজি হয়ে যাই। কাজেই আপত্তি করলাম না।

"খাওয়ার আগে মুকেশভাই ওঁর বাংলোটা ঘুরে ঘুরে দেখালেন। বিরাট বাংলো। কিন্তু ঘরগুলো ফাঁকা। ফার্নিচার প্রায় নেই বললেই চলে। কারণ জিজ্ঞেস করায় বললেন, ওঁর ইচ্ছে বাড়িটাকে গুজরাতের শিল্পকলা, অ্যান্টিক এসব দিয়ে সাজাবেন। আজকাল বাড়িতে অ্যান্টিক জিনিস কিছু না থাকলে জাতে ওঠা যায় না।

"আমি আবার তখন লাইব্রেরি থেকে আনা গুজরাতের ক্র্যাফ্টের ওপর একটা বই পড়ছিলাম। তাই ও বিষয়ে ছোটখাটো লেকচার ঝেড়ে দিলাম একটা। উনি মন দিয়ে শুনে বললেন, 'বাঃ, আপনি তো বেশ জানেন-শোনেন এ বিষয়ে, ইন্টারেস্ট আছে মনে হচ্ছে। অবশ্য বেঙ্গলিদের টেস্ট খুব আর্টিস্টিক হয়, এটা সবাই জানে।'

"বললাম, 'একজন ইন্‌টিরিয়র ডেকোরেটারকে ডেকে ভার দিলেই আপনার বাড়ি সাজিয়ে দেবে।'

"'পুরনো জিনিস দিয়ে বাড়ি সাজাব, তার জন্য আবার ইনটিরিয়র ডেকোরেটার ডাকা কেন? আমার বন্ধুরাই আমাকে সাহায্য করবে,' বলে আমার দিকে এভাবে তাকালেন, যেন আমাকে ওঁর বন্ধু হিসেবে গণ্য করছেন।

"অবশ্য এরপর মুকেশভাইয়ের সঙ্গে মোটামুটি বন্ধুত্ব হয়ে গেল আমার। চায়ের প্যাকেটের দরকার ছাড়াই মাঝে-মাঝে আমাকে নেমন্তন্ন করতে লাগলেন। রাত্রে খাওয়ার নেমন্তন্ন। খাওয়া শেষ হলে দু'জনে গল্পগুজবও হত, কারণ মুকেশভাইও আমার মতনই একা।

"একদিন রাত্রে ওঁর ফোন এল, 'বিরুভাই, কাল ফ্রি আছেন? সারা দিনের ব্যাপার কিন্তু।'

"এজেন্সি বিজনেসের সুবিধে এই যে, দশটা-পাঁচটার কোনও ব্যাপার নেই। বললাম, 'আপনি যখন বলছেন তখন ফ্রি আছি ধরে নিন। কিন্তু ব্যাপারখানা কী?'

"'জানেন তো, গুজরাতের কাঠের খোদাই-কাজ বিখ্যাত? বিশেষ করে পুরনো দিনের কাজ? আর আগেকার দিনে গ্রামের অনেক অবস্থাপন্ন ঘরেই খোদাই-কাজ-করা বাক্স, সিন্দুক, এসব থাকত। এমনকী, বাড়ির সামনের দরজাতেও ওরকম কাজ করা হত। আর আজকাল অনেক গ্রামেই ওইসব গৃহস্থেরা এইসব পুরনো কাঠের জিনিস বেচে বেশ আয় করছেন।'

"বললাম, 'হ্যাঁ, শুনেছি বটে!'

"মুকেশভাই বললেন, 'খবর পেলাম, বরোদার কাছাকাছি চিকোদরা বলে একটা গ্রামে মগনভাই বলে একজনের বাড়িতে

দুটো কাজ-করা ছোট পুরনো সিন্দুক আছে। জানেন তো, আমার শখ অ্যান্টিক জিনিস দিয়ে ঘর সাজানো ! তাই ও-দুটো কিনব ভাবছি। তবে জিনিস দুটোর বিউটি সম্বন্ধে আপনার মতামত পেলে ভাল হয়। আপনি যদি সঙ্গে যান…'

"ফ্রিতে বেড়ানোর সুযোগ পেলে ছাড়ার পাত্র নই আমি। বললাম, 'নিশ্চয়ই যাব। ক'টায় রেডি থাকব বলুন ?'

"'সকাল আটটায় আমি আসছি।'

"পরদিন ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় আটটায় মুকেশভাই এসে হাজির ওঁর অ্যামবাসাডারখানা নিয়ে। দেখলাম, নিজেই ড্রাইভ করছেন।

"'ড্রাইভার নিলেন না যে ?' জিজ্ঞেস করলাম।

"'অ্যান্টিকের ব্যাপারে বেশি জানাজানি না হতে দেওয়াই ভাল। আমার পাশের বাংলোর হরিবল্লভ প্যাটেলও অ্যান্টিকের খোঁজ করছেন। সব সময়ই আমার ওপর টেক্কা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছেন ভদ্রলোক। ড্রাইভারদের আবার বড্ড মুখ-আলগা হয়। তাই ভাবলাম, কী দরকার এসব জানাজানি করার।'

"শুনলাম চিকোদরা বরোদা থেকে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার আগে। আমরা তক্ষুনি রওনা দিলাম। দেখলাম, একটু বয়েস হলেও মুকেশভাইয়ের ড্রাইভিং-এর হাত পাকা। ঘণ্টা আড়াই-এর মধ্যেই চিকোদরা পৌঁছে গেলাম আমরা।

"বুঝলি বুলি, গ্রাম বললেই তোরা হয়তো বুঝিস কাঁচা রাস্তা, হ্যারিকেনের আলো আর খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘর। গুজরাতের বেশির ভাগ গ্রামই কিন্তু একদম অন্যরকম। চিকোদরাও তাই। গ্রাম হলেও অনেক রাস্তাই পাকা। ইঁটের দালান, রাস্তায় বিজলি আলো, আর বেশ কয়েকটা বাড়ির মাথায়ই টিভি'র অ্যান্টেনা।

"বললাম, 'মুকেশভাই, গ্রামটা বেশ বর্ধিষ্ণু মনে হচ্ছে।'

"'হবে না কেন ? এখানে চাষ তো বেশির ভাগই তামাকের। চাষিদের হাতে তাই বিস্তর কাঁচা পয়সা। মগনভাইও তামাকের চাষ করেন।'

"গ্রামটা বর্ধিষ্ণু হলেও খুব বড় নয়। একটু খুঁজতেই মগনভাইয়ের বাড়ি পেয়ে গেলাম। মগনভাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। 'আসুন, আসুন' বলে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। ওঁর বাড়িও পাকা। তদুপরি একটা বৈঠকখানাও আছে। ক্যাটকেটে সবুজ রঙের রেক্সিনে-মোড়া সোফাসেটে সাজানো। দেওয়ালে দেবদেবী ও ফিল্মস্টার দুয়েরই কালার প্রিন্ট ঝোলানো। আড়চোখে দেখলাম ঘরের এক কোণে টিভিও রয়েছে একখানা।

"গুজরাতি প্রথামতো যেতেই ঠাণ্ডা জল নিয়ে এল মগনভাইয়ের মেয়ে। মগনভাই বললেন, 'এখানেই দুপুরের খাওয়া খেয়ে যাবেন।'

"মুকেশভাই বললেন, 'ভাল প্রস্তাব দিয়েছেন। খাওয়াদাওয়া সেরে যদি বিশ্রাম করতে পারি কিছুক্ষণ, তা হলে আর রোদ্দুরে গাড়ি চালাতে হয় না। বিকেলে রওনা দেব, কেমন ?' বলে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

"এতে আমার আপত্তি করার কিছু ছিল না। তবে মগনভাই বললেন, 'কাজের কথা আগে হয়ে যাওয়াই ভাল। চলুন, সিন্দুক দুটো দেখবেন।'

"বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে পেছনের দিকে একটা ঘরে আমাদের নিয়ে এলেন মগনভাই। দরজাটা তালাবন্ধ। পকেট থেকে চাবি বার করে খুললেন উনি। ঘরে ঢুকলাম আমরা। ঘরে একটাও জানালা নেই। বেশ অন্ধকার। আলো জ্বাললেন মগনভাই। দেখলাম, বেশ কম পাওয়ারের বাল্‌ব।

"সেই ম্লান আলোতে দেখলাম তিনটে কাঠের সিন্দুক,

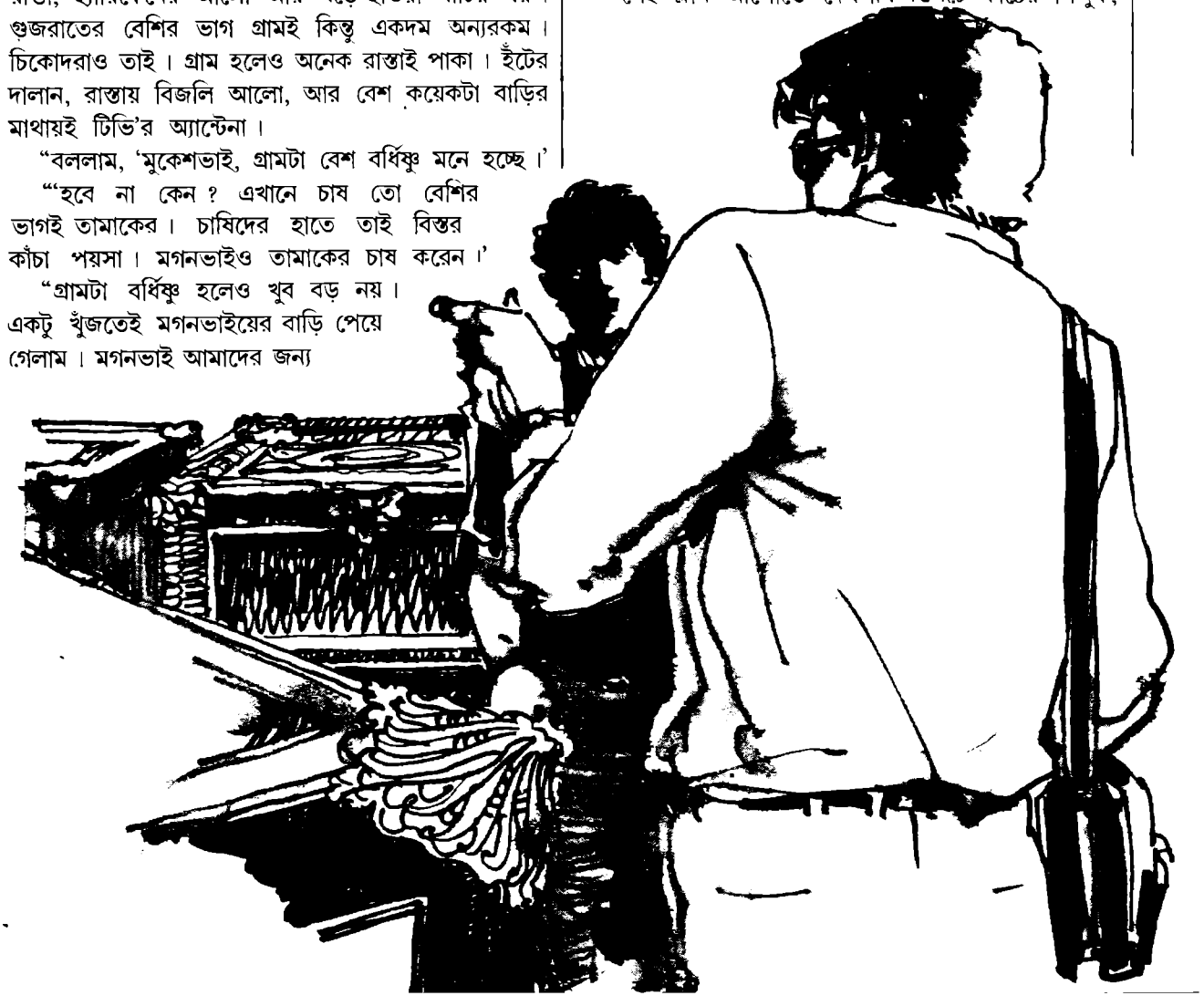

এবার এলো

ক্লিয়ারাসিল দীপ্তি

নতুন ক্লিয়ারাসিল সাবান
যা বাড়তি তেল দূর করে দিয়ে আপনাকে দেয়
এক পরিষ্কার, ঝলমলে উজ্জ্বল, রূপ!

নতুন ক্লিয়ারাসিল সাবান...ঠিক এমন সাবান দিয়ে আপনি আগে কখনো স্নান করেন নি। কারণ, অন্যান্য সাবানের থেকে আলাদা এই নতুন ক্লিয়ারাসিল সাবানের অফুরন্ত ফেনা আর বহুক্ষণ থেকে যাওয়া সুগন্ধ আপনার ভালো লাগবে তাই নয়...তার সাথে আপনার ত্বককে ক'রে তুলবে আরো সতেজ!

কারণ, এর বিশেষ উপাদান ও অফুরন্ত ফেনা আলতো ভাবে ধুয়ে দেয় আপনার রোমকূপে জমা বাড়তি তেল, যাতে আপনার ত্বককে দেখায় আগের থেকে আরো পরিষ্কার ও ঝকঝকে আর ত্বকে ফুটে ওঠে ক্লিয়ারাসিল দীপ্তি!

তৈলাক্ত ত্বকের জন্য নতুন ক্লিয়ারাসিল সাবান

OBM/5428/BEN

পাশাপাশি রাখা। দুটো মাঝারি মাপের এবং এক সাইজের। তৃতীয়টা অনেক ছোট। তিনটে সিন্দুকই কালচে দেখাচ্ছে, পুরনো হওয়াতেই বোধহয়। আর তিনটে সিন্দুকের গায়ে আর ডালায় চমৎকার খোদাই-করা কাজ।

"আমি বেশ মুগ্ধ হয়ে খোদাই-কাজ দেখতে লাগলাম। মুকেশভাই কিন্তু প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই ছোট সিন্দুকটা কার জন্যে ?'

"মগনভাই বললেন, 'ওটা অন্য এক শেঠ বুক করে গেছেন। দু-এক দিনের মধ্যেই এসে নিয়ে যাবেন।'

"'কোন্ শেঠ ?'

"'মাপ করবেন, নাম বলতে মানা আছে। আপনি যে দুটো সিন্দুক নেবেন বলেছেন, সেগুলো দেখুন না !'

"সিন্দুক দুটোর দিকে এক নজর তাকিয়ে মুকেশভাই বললেন, 'এক গেলাস জল খাওয়াতে পারেন ?'

"'দাঁড়ান, নিয়ে আসি, বলে মগনভাই বেরিয়ে গেলেন।

"মুকেশভাই তক্ষুনি আমার দিকে ফিরে বললেন, 'বিরুভাই, আমার সন্দেহ হচ্ছে এই ছোট সিন্দুকটা হরিবল্লভ প্যাটেলই বুক করিয়েছেন। ওঁকে আমি এসব অ্যান্টিকের মালিক হতে দেব না। আমি তিনটে সিন্দুকই কিনতে চাই।'

"বললাম, 'তা কিনুন, কিন্তু এই মগনভাইয়ের খবর আপনি পেলেন কোথা থেকে ?' "

"'আমার বন্ধু হীরালাল চম্পালালের কাছ থেকে। উনি আবার মগনভাইয়ের খোঁজ পেয়েছিলেন ওঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে।'

"'তার মানে ওঁদেরকেও মগনভাই এরকম অ্যান্টিক সিন্দুক বেচেছিল ?'

"'হ্যাঁ।'

"জানিস তো বুলি, আমার একটু খুঁতখুঁতে মন। তাই কেমন খটকা লাগল। শুনেছিলাম এই সিন্দুকগুলি মগনভাইয়ের পরিবারের পুরনো সিন্দুক। কিন্তু ওঁদের পরিবারে ক'টা সিন্দুক ছিল ? পাঁচ-ছ'টা ? একটু আজগুবি মনে হচ্ছে নাকি ?

"কিন্তু ততক্ষণে মগনভাই জলের গেলাস নিয়ে ফিরে এসেছেন। তাই আমার সন্দেহের কথাটা আর মুকেশভাইকে বলা হল না। জল খেয়ে উনি একপাশে সরে নিচু গলায় মগনভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন, বোধহয় দামের বিষয়ে। আমি সিন্দুক দুটোর দিকে মন দিলাম। মগনভাই একবার আমার দিকে ফিরে বললেন, 'পুরনো জিনিস, ধুলোবালি পরিষ্কার করা হয়নি, আপনার হাতে ধুলো লাগবে।'

"বললাম, 'তাতে কী, হাত ধুয়ে নেব। তবে সিন্দুকগুলো তো বলছেন আপনার ঠাকুরদার বাপের আমলের। আপনার বাড়িটাও কি তাই ? এখনও কিন্তু বেশ মজবুত আছে।'

"মগনভাই হেসে বললেন, 'আরে না, না, এ-বাড়ি তো আমি বানিয়েছি বছর পনেরো আগে। আমার ঠাকুরদা বা তাঁর বাবা খুব গরিব ছিলেন। মেটেঘরে থাকতেন। জমিজমা করেন আমার বাবা। আমিও অবশ্য সাধ্যমতো বাড়িয়ে গেছি,' বলে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন।

"ওঁর কথা শুনে আমার কিন্তু সন্দেহ বেড়ে গেল। মগনভাইয়ের পূর্বপুরুষেরা গরিব ছিলেন, মাটির ঘরে থাকতেন, তবু পাঁচ-ছ'টা খোদাই-কাজের সিন্দুক কিনলেন কী করে ? আজকালকার মতো না হলেও কিছু দাম তো ছিলই তখন ? তবে কি সিন্দুকগুলো পুরনো নয় ? আমাদের ঠকাচ্ছেন মগনভাই ?

"সিন্দুকগুলো আরও খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। আর ডালা তুলে ভেতরটা দেখতে গিয়েই ব্যাপারটা আমার চোখে পড়ল। ডালার কব্জাটার স্ক্রুগুলো ধুলোর আস্তরণের ভেতর থেকেও কেমন চকচক করছে। মগনভাইয়ের চোখে যেন না পড়ে, এভাবে পিছন ফিরে পকেট থেকে রুমাল বার করে কব্জাটা ভালভাবে ঘষে দিতেই দেখলাম স্ক্রু দুটো সত্যিই চকচক করছে। এবং সন্দেহ নেই ও দুটো একেবারে নতুন।

"এরপর অন্য সিন্দুকটা খুলে তার কব্জা ঘষতেই দেখলাম, ওর স্ক্রুগুলোও নতুন। অর্থাৎ যতদূর মনে হচ্ছে, সিন্দুক দুটো পুরনো নয়, হালের তৈরি।

"একবার ভাবলাম মগনভাইকে চেপে ধরি। তারপর ভাবলাম, আর একটু প্রমাণ জোগাড় করতে হবে। নয়তো আমার অভিযোগের উত্তরে মগনভাই যদি বলেন যে, পুরনো কব্জা খারাপ হওয়াতে নতুন কব্জা লাগিয়েছেন উনি ?

"সিন্দুক দুটো আরও ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। আবিষ্কার করলাম যে, খোদাই-কাজের ডিজাইনে খুব সামান্য হেরফের থাকলেও দুটোই মোটামুটি এক। তারপর তৃতীয় সিন্দুকটা দেখতে গিয়ে দেখি, ওটার ডিজাইনটাও মোটামুটি একই ধরনের। ঠিক যেন অর্ডারি মাল। আমার সন্দেহটা আর-একটু বাড়ল।

"কী করব ভাবছি, এমন সময় মুকেশভাই আমাকে ডেকে হেসে বললেন, 'বিরুভাই, মগনভাই তিনটি সিন্দুকই আমাকে বেচতে রাজি হয়েছেন মোট পঁচিশ হাজার টাকায়।'

"পঁচিশ হাজার ! আমি তো থ বনে গেলুম। অ্যান্টিক জিনিস দামি হয় জানি, কিন্তু তাই বলে এত দাম ? মুকেশভাইকে কিন্তু একটুও বিচলিত মনে হল না। বরঞ্চ মনে হল, উনি এরকম একটা কিছুই আশা করছিলেন এবং টাকা সঙ্গেই এনেছেন।

"হাতে কিছু সময় নেবার জন্যে বললাম, 'ভেরি গুড। কিন্তু টাকার লেনদেনটা খাওয়া-দাওয়ার পর করলে হয় না ? মগনভাই, চিকোদরার হাওয়ায় যেন খিদেটা চাগিয়ে উঠেছে।'

"উনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই। এক্ষুনি খাবার বন্দোবস্ত করছি।'

"ভূরিভোজটা ভালই হল। খেতে-খেতে মুকেশভাই একবার নিচু গলায় আমায় বললেন, 'সিন্দুকগুলোর বিউটি সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয় ?'

"সিন্দুকগুলো পুরনো হোক বা না হোক, খোদাই-কাজগুলো ছিল সত্যিই সুন্দর। তাই বিনা দ্বিধায় বলতে পারলাম, 'ফার্স্টক্লাস।'

"খাওয়ার পর মুকেশভাই বললেন, উনি একটু বিশ্রাম নিতে চান। আমি কিন্তু আমার ঝোলানো ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে বললাম, 'আমি একটু ঘুরে আসছি। গ্রামটা দেখতে চাই।'

"মগনভাই ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'এই রোদ্দুরে আবার কোথায় যাবেন ?'

"ভাগ্যিস সঙ্গে হট-শট ক্যামেরাটা ছিল। ঝোলা থেকে ওটা বার করে বললাম, 'আমার ছবি তোলার শখ আছে মগনভাই। গ্রামের ছবি তুলতে চাই ক'টা।'

"মগনভাই জিজ্ঞেস করলেন, 'সঙ্গে কাউকে দিই ?'

"'না, না। দরকার হবে না,' বললাম আমি, 'নতুন জায়গায় একা বেড়ানোর একটা অ্যাডভেঞ্চার আছে।' যদিও শেষের কথাটা মগনভাই ঠিক অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারলেন কি না কে জানে !

"বেরিয়ে তো পড়লাম এবং ক্যামেরাটায় দু-চারটে এলোপাথাড়ি শটও নিলাম। কিন্তু যে কাজের জন্য বেরোলাম সেটা করব কী ভাবে ? মনে হল বসে একটু চিন্তা করা দরকার। একটু হাঁটতেই পেয়ে গেলাম একটা চায়ের দোকান, প্রায় ফাঁকা। ঢুকে এক গেলাস চায়ের অর্ডার দিলাম।

"চা খেলে বুদ্ধি খোলে, জানিস তো বুলি ? তাই গেলাসে দু-তিন চুমুক দিতেই মাথায় একটা আইডিয়া খেলে গেল। না, কথাটা ঠিক হল না। সাধু বাংলায় আমার বলা উচিত যে, একটা অনুপ্রেরণা এল। মনে হল সিন্দুকগুলো যদি নতুন হয়, তবে ওগুলি কাছাকাছি কোথাও তৈরি হবে নিশ্চয়ই। কারণ, মগনভাই তো কোনও দূরের শহর বা গ্রাম থেকে বাস বা ট্রাক করে সিন্দুক আমদানি করবেন না, যাতে বেশি লোক-জানাজানির চান্স থাকে ! কিন্তু কাছাকাছি এমন কোনও কাজ হলে গ্রামের কেউ না কেউ কি সে খবর জানবে না ?

"অনুপ্রেরণার ভর তখনও মাথায় জোরদার। চায়ের দোকানদারকে বললাম, 'আমি একজন সাংবাদিক। শুনলাম, এখানে একজন কারিগর আছে, যে কাঠের খোদাই-কাজ চমৎকার করে। ওর ইন্টারভিউ নিতে এসেছি। বাড়িটা কোথায় একটু বলে দিতে পারেন ?'

"চায়ের দোকানদার বললেন, 'ইন্টারভিউ ? মানে কাগজে ছাপা হবে ? তা, আমাদের গ্রামের একটি ছেলেই এই কাজ করে। অনিল মাকওয়ানা। দু-এক বছর আগে এই গাঁয়ে এসেছে। ওর বাড়ি হচ্ছে নভসিরিতে। ওখানেই আগে থাকত। হ্যাঁ, আমার দোকানের এই বাচ্চা ছেলেটাই আপনাকে ওর বাড়ি পৌঁছে দিতে পারবে।'

"এত সহজেই খবরটা পেয়ে যাব ভাবিনি। কৃতজ্ঞতার চোটে আর এক গেলাস চায়ের অর্ডার দিয়ে দিলাম।

"চায়ের দোকানের বাচ্চা ছেলেটা এরপর আমাকে অনিল মাকওয়ানার বাড়ি পৌঁছে দিল। গিয়ে দেখলাম, যা ভেবেছিলাম তাই। বাড়ির সামনের দিকের ঘরেই কাঠ-খোদাইয়ের কাজ হচ্ছে। তখন দুপুরবেলা বলেই হয়তো একজনই শুধু বসে কাজ করছিল, বছর তিরিশেক বয়েস হবে, বেশ দোহারা চেহারা। কিন্তু চেহারায় একটা নম্র ভাব আছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে নমস্কার করে বলল, 'হ্যাঁ, আমিই অনিল মাকওয়ানা। কিছু অর্ডার দেবেন ?'

"আমি ঘরের চারদিকটা দেখছিলাম। কাঠের টুকরোর ছড়াছড়ি, কাঠ-খোদাইয়ের নানা যন্ত্রপাতি এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। কাগজের টুকরোয় লতাপাতার ডিজাইন আঁকা। সারা ঘরে তার্পিন তেলের গন্ধ। অনিল মাকওয়ানা একটা দরজার হাতলের ওপর কাজ করছিল।

"জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটা অবশ্য ওকেও বলতে হল। অর্থাৎ, আমি একজন সাংবাদিক ইত্যাদি। ছেলেটি তো মহাখুশিই। বলল, 'কাগজে ছাপা হবে এই ইন্টারভিউ ? গুজরাতি কাগজে ?'

"'নিশ্চয়ই। ইংরিজি কাগজেও।' ভাগ্যিস সঙ্গে একটা নোটবই ছিল, তাতে কিছু টুকে নিলাম অনিল মাকওয়ানার সম্বন্ধে। ছবিও তুললাম দুটো। কিন্তু যে-কথা জানতে এসেছি সেটা জানব কী করে ? এ-ঘরটায় তো কোনও সিন্দুকের চিহ্ন নেই।

"লক্ষ করলাম, সামনের দরজাটা বাদে ঘরটায় আরও দুটো দরজা। একটা দরজা বারান্দার দিকে খোলা। অন্য দরজাটা একটা ঘরের, মনে হল শুধু ভেজানো।

"বেশ নির্লজ্জের মতো এক কাপ চা চেয়ে বসলাম। অনিল মাকওয়ানা উঠে বারান্দা দিয়ে ভিতর-বাড়িতে গেল চায়ের কথা বলতে। আর আমিও সেই সুযোগে ভেজানো দরজাটা ঠেলে ঢুকে পড়লাম। হ্যাঁ, একটা ঘরই বটে। তবে অন্ধকার। হাতড়ে আলোর সুইচটা টিপে দিতেই দেখি সামনে দুটো সিন্দুক। মুকেশভাই যেরকম কিনতে যাচ্ছেন অবিকল সেরকম দেখতে। খোদাই ডিজাইনও এক। তফাত শুধু এই যে, এ-দুটো চকচটে নতুন, গা থেকে পালিশের গন্ধ বেরোচ্ছে। ক্যামেরাটা বার করে ক্লিক-ক্লিক করে দুটো ছবিও নিলাম।

"ক্যামেরাটা ব্যাগে পুরে ঘুরেই দেখি দরজায় অনিল মাকওয়ানা দাঁড়িয়ে। মুখখানা ফ্যাকাসে। বলল, 'এগুলো এক খরিদ্দারের অর্ডার।'

"বললাম, 'হ্যাঁ, জানি। এ-গাঁয়ের মগনভাই, যিনি এগুলো অ্যান্টিক বলে চালাচ্ছেন।'

"'আঃ, আপনি কী যা-তা বলছেন ?' দেখলাম অনিল মাকওয়ানা ঘামতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু বলেছিলাম না, ছেলেটিকে দেখে মনে হয়েছিল একটু নরম স্বভাবের ? তাই একটু ভড়কি দিতেই সব স্বীকার করে ফেলল। মগনভাই যে ওকে এই কাজের জন্যেই নভসিরি থেকে আনিয়েছেন, তাও। কিন্তু নতুন সিন্দুককে কী করে পুরনো সিন্দুকের চেহারা দেয়, সে সম্বন্ধে মুখ খুলল না। বলল, সেটা নাকি মগনভাই করেন। আমিও আর পীড়াপীড়ি করলাম না। আফটার অল, আমি তো আর ওই ব্যবসা করতে যাচ্ছি না।

"মগনভাইয়ের ওখানে ফিরে দেখি বারান্দায় অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন মুকেশভাই। আর-একটা চেয়ারে বসে মগনভাই। বাড়ির সামনে দাঁড় করানো মুকেশভাইয়ের গাড়ির ওপরের কেরিয়ারে চটে মোড়া দুটো সিন্দুক। তৃতীয়টা বোধহয় ডিকিতে।

"মুকেশভাই আমাকে দেখেই রাগত সুরে বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলেন বিরুভাই ? আপনার জন্য কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি, রওনা হতে বড্ড দেরি হয়ে গেল।'

"একটা খালি চেয়ার টেনে জুত করে বসে মগনভাইয়ের দিকে চেয়ে বললাম, 'গিয়েছিলাম অনিল মাকওয়ানার কাছে।'

"'অনিল মাকওয়ানা ! সে আবার কে ?' মুকেশভাই কিছুটা বিস্মিত।'

"বললাম, 'সেটা হয়তো মগনভাই-ই আপনাকে ভাল বলতে পারবেন। তবে মুকেশভাই, পঁচিশ হাজার টাকা যদি মগনভাইকে দিয়ে থাকেন, তবে ফেরত নিন এক্ষুনি। সিন্দুকগুলো অ্যান্টিক নয় মোটেই।'

"মুকেশভাই তো হতভম্ব। মগনভাই গর্জে উঠলেন, 'কী যা-তা বলছেন আপনি ?'

"বললাম, 'শান্তি, শান্তি। উত্তেজিত হবেন না খামোকা। যা বলতে এসেছি শুনুন আগে।'

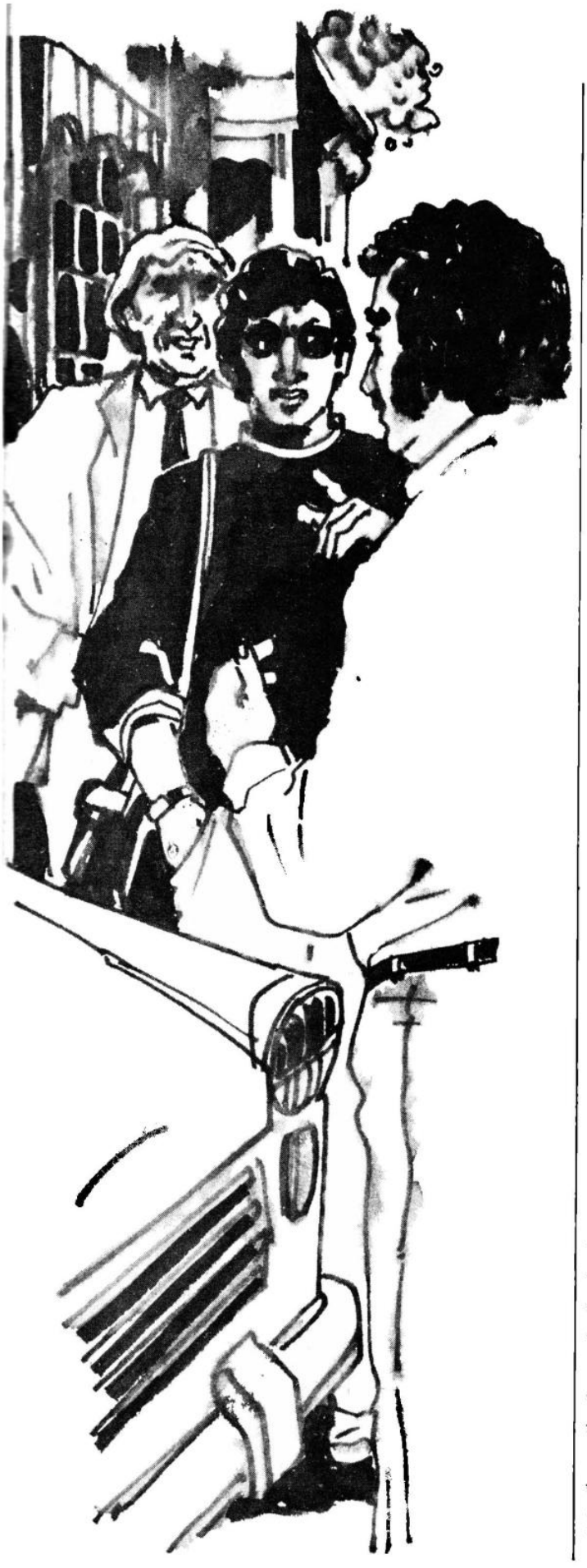

"এরপর খুলে বললাম সবকিছু। আমার সন্দেহের কথা, অনিল মাকওয়ানার খোঁজ পাওয়া, ওর সবকিছু স্বীকার করা···· ইত্যাদি।

"মুকেশভাই এমনিতে বেশ ঠাণ্ডা মানুষ। কিন্তু সব শুনে অসম্ভব রেগে গেলেন। মগনভাইকে মারতে যান আর কি। বললেন, 'আমি এক্ষুনি পুলিশে যাচ্ছি। তোমার নামে কেস করব।' মগনভাইয়ের অবস্থা তখন কাহিল।

"অতি কষ্টে থামালাম মুকেশভাইকে। বললাম, 'থানা-পুলিশ করে কী হবে মুকেশভাই? সাক্ষি দেওয়া বা দিনের পর দিন কোর্টে হাজিরা দেওয়ার সময় কোথায় আপনার? এর চেয়ে আপনার টাকা ফেরত নিয়ে নিন, আর মগনভাই যদি কথা দেন যে এ-বিজনেস আর করবেন না···'

"মগনভাই হাত জোড় করে বললেন, 'অবশ্যই কথা দিলাম। এ-বিজনেস আর না।' টাকাও চটপট ফেরত দিয়ে দিলেন।

"'মগনভাইয়ের লোকেরা গাড়ি থেকে সিন্দুকগুলো নামাতে যাবে, এমন সময় আমার মাথায় আবার একটা আইডিয়া এসে গেল। মুকেশভাইকে বললাম, 'দেখুন, সিন্দুকগুলো অ্যান্টিক নয় বটে, কিন্তু ওদের খোদাই-কাজ খুব সুন্দর। অনিল মাকওয়ানা সত্যি একজন শিল্পী। আপনি ওগুলো নতুন সিন্দুকের দরেই কিনে নিন না কেন? আপনার ঘরে ওগুলো চমৎকার মানাবে।'

"'কিন্তু বিরুভাই, সবাই যে অ্যান্টিক দিয়ে ঘর সাজায়?'

"আমি তখন ওঁকে একটা ছোটখাটো লেকচার ঝেড়ে দিলাম। বললাম, 'পুরনো জিনিসের কদর আছে বইকী। কিন্তু আজকের কোনও শিল্পী স্বর্গে না যাওয়া পর্যন্ত পাত্তা পাবে না এ কেমন কথা····' ইত্যাদি ইত্যাদি।

"শেষ পর্যন্ত মুকেশভাই ওগুলো কিনতে রাজি হলেন। মগনভাইও সিন্দুকগুলো বেচতে পেরে মহাখুশি। অবশ্য দাম নিয়ে দরকষাকষি হল খানিকটা। শেষ পর্যন্ত পঁচিশ হাজারের বদলে পঁচিশশোতে সিন্দুকগুলো কিনলেন মুকেশভাই।

"আমেদাবাদে ফিরে সোজা নিজের বাংলোতে চলে এলেন মুকেশভাই। আমার পরামর্শমতো বড় দুটো সিন্দুক ওঁর হলঘরে ও ছোট সিন্দুকটা ওঁর স্টাডিরুমে রাখলেন। সত্যি চমৎকার দেখাচ্ছিল সিন্দুকগুলোকে। মুকেশভাইও স্বীকার করলেন সে-কথা।

"এ পর্যন্ত ছোট সিন্দুকটা খুলিনি আমরা। তখন খুললাম। ওই সিন্দুকেই ছিল এই ছোট বাক্সটা। বোধহয় অনিল মাকওয়ানা ভুলে রেখেছিল। বাক্সটা বার করে একটু উলটে-পালটে দেখলেন মুকেশভাই। তারপর আমাকে ওটা দিয়ে বললেন, 'বিরুভাই, এটা আপনাকে দিলাম।' আর বুলি, আমিও তক্ষুনি ঠিক করে ফেললাম যে, এই বাক্সটা তোর জন্যে—।"

ছোটমামার গল্প শেষ হলে মা বললেন, "কিন্তু বিরু, তোর মুকেশভাই বড্ড কিপটে মনে হচ্ছে। ওর অতগুলো টাকা বাঁচিয়ে দিলি, আর তোকে দিল শুধু ছোট একটা বাক্স?"

ছোটমামা হেসে বললেন, "যদি একটা সিন্দুক দিয়ে দিতেন, তা হলে তোমার এই ছোট্ট ঘরে রাখতে কোথায় ছোড়দি?"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আজব কাণ্ড

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

সন্ধে-সকাল যে বাবুটি
হাঁকিয়ে চলেন এক্কা,
কেরদানিতে পারবে না কেউ
মারতে তাঁকে টেক্কা।

মাসি গো মাসি পাচ্ছে হাসি,
পেছন-পেছন ধায় কে ?
বাগিয়ে ধরে মস্ত ধামা,
মারছে গুঁতো পাইকে !

এক্কাবাবু মারছে মাছি,
অমনি ধরে পাখনা,
একটি করে ধামায় ভরে
ঢাকছে ধামার ঢাকনা।

যেই-না হঠাৎ এক্কামশাই
হাঁকল, 'তুমি কে হে ?'
অমনি ধামার ঢাকনা তুলে
হাস্যমুখের 'হেঁ-হেঁ'।

ছবি : দেবাশিস দেব

অন্যায়

সুবন্ধু ভট্টাচার্য

বাবা বলেছেন, কিনে দেব বন্দুক ;
ঠাম্মা বলেছে, কিনে দেব ব্যাগাডুলি ;
জেঠু বলেছেন, আগে তো টুবলা আসুক
ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে, তখন না হয় তুলি
রং-পেন্সিল যা চাইবে দেওয়া যাবে।
বম্মা বলেছে, বুনে দেব সোয়েটার
যদি ফার্স্ট হও, নইলে ঘেংচু পাবে ;
সার্কাসে নিয়ে যাওয়াই হবে না আর।

টুবলা ভাবছে, ভাই যদি পেয়ে যায়
ফার্স্ট না হয়েই সব কিছু ; তবে কেন
তার প্রতি এত শর্ত আরোপ ? যেন
সে করে ফেলেছে মহা এক অন্যায়।

সারমেয় সমাচার

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই সুরথবাবু দেখলেন, একটা কুকুর ঠিক তাঁর সদর-দরজার চাতালটার ওপরে শুয়ে আছে। সুরথবাবু মুখের শব্দ করলেন, হেট্ হেট্। শব্দ শুনে কুকুরটা একবার চাইল ওপর দিকে। সুরথবাবু আবার শব্দ করলেন, হেট্ হেট্, যাঃ। কুকুরটা এবার একটু কেঁউ-কেঁউ শব্দ করল। সুরথবাবু নিজের মনেই বললেন, আ গেল যা, ব্যাটা নড়ে না। একটা কাগজ পাকিয়ে কুকুরটাকে লক্ষ করে ছুঁড়লেন। কাগজটা প্রথমে গিয়ে পড়ল কুকুরটার গায়ে, তারপর পড়ল ঠিক তার মুখের সামনে। কুকুরটা মুখ বাড়িয়ে কাগজটাকে একবার শুঁকল, কিন্তু নড়ল না।

এমন সময় সুরথবাবুর সামনের বাড়ির বারান্দায় এলেন মন্মথবাবু। সুরথবাবুকে 'হেট্ হেট্' বলতে শুনে মন্মথবাবু বললেন, "কী সুরথবাবু, গোরু ঢুকেছে নাকি বাগানে ?"

"আরে না মশাই, গোরু-টোরু নয়। একটা কুকুর শুয়ে আছে ঠিক আমার সদর-দরজার সামনে।"

সুরথবাবুর কথা শুনে মন্মথবাবু একেবারে ভূত দেখার মতো লাফিয়ে উঠলেন। "অ্যাঁ, বলেন কী ! কুকুর ! কী কুকুর ? নেড়ি কুকুর ? রং কী ? কালো ?"

"আরে মশাই আমি কি ওর পেডিগ্রি দেখেছি নাকি যে জানব ওটা নেড়ি না দো-আঁশলা। তবে রংটা দেখছি কালো।" সুরথবাবুর মুখে ঘোর বিরক্তি।

মন্মথবাবু আরও যেন চিন্তিত হলেন, "কালো কুকুর ! বাড়ির দরজার সামনে !"

সুরথবাবু এবার একটু ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল মন্মথবাবু ? আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি যেন অশুভ কিছুর ইঙ্গিত পাচ্ছেন ?"

চোখ রগড়াতে রগড়াতে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন সুরথবাবুর স্ত্রী। তিনি বিছানায় শুয়ে-শুয়েই মন্মথবাবুর কথাগুলো শুনেছিলেন। তাই সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, "দেখুন, ভয় দেখাবেন না, আপনার কী মনে হচ্ছে খুলে বলুন।"

"না না, ভয় কেন দেখাব। তবে কী জানেন, একে কুকুর, তায় আবার কালো রং। তার ওপর এসে শুয়েছে ঠিক পুবের দরজার গোড়ায়। তাই আর কি, মানে ইয়ে···" মন্মথবাবুর মুখে কথা আটকে গেল।

"আরে মশাই, আপনি তো ব্যাঘ্রের মানে করলেন শার্দূল। ভয় দেখাব না বলে, আরও ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন। ব্যাপারটা কী, খুলে বলুন তো ?" সুরথবাবুর স্ত্রীকে যেন একটু বিচলিত মনে হল।

"না, মানে ইয়ে আর কি। মানে কুকুর···"

এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন সুরথবাবু। এবার একটু চাঙ্গা ভাব দেখিয়ে বললেন, "কুকুর তো হয়েছে কী ? কুকুর তো যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে স্বর্গের পথের সঙ্গী হয়েছিল।"

যেন ক্লুটা পেয়ে গেছেন, সেইভাবে বলে উঠলেন মন্মথবাবু, "অ্যাই, তবেই বুঝুন। জানেন তো, যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শন হয়েছিল ? কেন ?"

"কেন ?"

"কেন আবার, ওই কুকুর···"

সুরথবাবু এবার বেশ বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "দূর মশাই, আপনার যত সব মনগড়া গপ্প। কত পুণ্য থাকলে তবে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে স্বর্গপথে যাওয়া যায়···।"

ঠিক এই সময় কুকুরটা একটু জোরে ডেকে উঠল।

মন্মথবাবু বললেন, "কুকুরের কান্না কিন্তু খুব খারাপ জিনিস। মানে ইয়ে আর কি···"

সুরথবাবুর স্ত্রী কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন, "কী যে ইয়ে-ইয়ে করছেন, বুঝতে পারছি না।"

"না না, মানে, ইয়ে আর কি। ভয়ের মধ্যেও আমাদের সাহস আনতে হবে," বলে একটা ইঁটের টুকরো বারান্দার ওপর থেকে মন্মথবাবু ছুঁড়ে দিলেন কুকুরটার গায়ে।

কুকুরটা এবার ওপর দিকে মুখ তুলে ঘেউ-ঘেউ করে উঠল।

মন্মথবাবু আঁতকে উঠলেন, "ও মশাই, এ নির্ঘাত পাগলা কুকুর।"

সুরথবাবুর স্ত্রী বললেন, "তা হলে কী হবে ?"

"সর্বনাশ !"

"সর্বনাশ ?" সুরথবাবুর স্ত্রী বুঝি কেঁদেই ফেলেন।

"হ্যাঁ, একেবারে সর্বনাশ। আঠারোটার ধাক্কায় ফেলবে।"

শুনে সুরথবাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, "আঠারোটা ! সেটা আবার কী ?"

এত দুঃখের মধ্যেও সুরথবাবুর অজ্ঞতা দেখে বেশ বিজ্ঞের হাসি হাসলেন মন্মথবাবু, "আঠারোটা ইনজেক্শন নিতে হবে পেটে। এই ইয়া বড় সিরিঞ্জ।"

"আরে মশাই, সে তো কামড়ালে।"

"কামড়াবে, নির্ঘাত কামড়াবে।"

"তা হলে কী হবে মন্মথবাবু ?" সুরথবাবুর স্ত্রীর গলায় কান্না।

"ওই আঠারোটার ধাক্কায় পড়তে হবে। নইলে মৃত্যু !"

"মৃ—ত্যু !"

"হ্যাঁ, মৃত্যু। জানেন তো, পাগলা কুকুর কামড়ালে তার বিষ দেহে আঠারো বছর থাকে ?" মন্মথবাবুর মুখে সবজান্তার ভাব।

"আ—ঠা—রো ব—ছ—র !" সুরথবাবুর স্ত্রীর যেন আর চিন্তা করার শক্তি নেই।

"হ্যাঁ, আঠারো বছর। আমার নিজের চোখে দেখা। জলাতঙ্ক, বুঝলেন জলাতঙ্ক। আঠারো বছর পরে কুকুরের ডাক ডাকতে ডাকতে মরে গেল। আর সে কী কষ্ট !" মৃত্যুটা যেন চোখের সামনে দেখছেন, মন্মথবাবুর চোখ-মুখের সেইরকম ভাব।

ঘটনাস্থলে আবির্ভূতা হলেন মন্মথগৃহিণী। এসেই গম্ভীর গলায় বললেন, "সারা সকাল কি কুকুর নিয়ে মেতে থাকলেই চলবে ? বলি বাজার-টাজার যেতে হবে না ?"

মন্মথবাবু বললেন, "বাজার ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? দেখছ না পাগলা কুকুর শুয়ে রয়েছে ঠিক সুরথবাবুর দরজার গোড়ায় !"

মন্মথগৃহিণী স্বামীর কথা শুনে জ্বলে উঠে বললেন, "মাথা খারাপ আমার হয়নি, তোমার হয়েছে ! সকাল থেকে একটা কুকুর নিয়ে পাড়া একেবারে মাথায় করে ছাড়লে !"

"শুনুন সুরথবাবু, শুনুন। বলে কিনা শুধু একটা কুকুর ! জানে না তো, আঠারো বছরের ধাক্কায় ফেলে দিতে পারে।" স্ত্রীর দিকে একটা করুণার চাউনি চাইলেন মন্মথবাবু।

সুরথবাবু করুণ কণ্ঠে বললেন, "ও মন্মথবাবু, কী করা যায় বলুন তো ? ডাক্তারখানায় না গেলেই নয়।"

মন্মথবাবুর চোখ কপালে উঠল, "কেন মশাই, আপনি কি আঠারোটা ইনজেকশন আগেভাগেই কিনে রাখতে চান নাকি ?"

"আরে না, কাল থেকে বাতের ব্যথা বড্ড বেড়েছে, তাই একবার ডাক্তারখানায় যাওয়া দরকার।"

"আরে মশাই, জলাতঙ্কের চেয়ে বাতব্যাধি অনেক ভাল। ডাক্তারখানায় না গিয়ে এখন পরামর্শ করুন কী করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।"

সুরথবাবু খানিক চিন্তা করে বলেন, "আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না ?"

মন্মথবাবু ব্যগ্র হয়ে তাকান সুরথবাবুর দিকে।

"ওপর থেকে থান-ইঁট ছুঁড়ে যদি মারা যায় ব্যাটার ঠিক মাথায় ?"

শুনে মন্মথবাবু বলেন, "হ্যাঁ সুরথবাবু, আপনি না উকিল ছিলেন ?"

"হ্যাঁ, ছিলামই তো।"

"এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি ওকালতি করতেন ?"

মন্মথবাবুর বিদ্রূপের হাসিটা ভাল লাগে না সুরথগৃহিণীর। বলে উঠলেন, "দেখুন মন্মথবাবু, অবান্তর কথা বলবেন না। আপনিই বা ডাক্তারি করে কী এমন বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। সারা জীবনভোর তো কেবল মানুষ মেরেছেন।"

এইবার খেপে গেলেন মন্মথগৃহিণী, "তা তো বটেই। নইলে মেয়ের অসুখের সময় এখানে কেঁদে এসে পড়তেন না। নেমকহারাম আপনারা, আপনাদের উপকার করাও পাপ।"

সুরথগৃহিণী একেবারে যেন জ্বলে উঠলেন, "কী নেমকহারামি করেছি আপনাদের সঙ্গে ? বিনা পয়সায় ডাক্তারি করেননি, রীতিমত পয়সা দিয়েছি, তাই চিকিৎসা করেছেন। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব ?"

মন্মথগৃহিণী এ-কথার জবাব খুঁজে না পেয়ে 'অ্যাঁ-অ্যাঁ' করতে লাগলেন।

মন্মথবাবু বলে উঠলেন, "আঃ, করো কী তোমরা ? ছেলেমানুষের মতো ঝগড়া শুরু করে দিলে যে !"

সুরথবাবুও সুযোগ পেয়ে গেলেন। স্ত্রীকে ঠাণ্ডা করার জন্যে বেশ মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, "দেখছ, এখন কী বিপদ আমাদের। এখন কি কথা-কাটাকাটি করা উচিত ?"

"বিপদই তো। ভয়ানক বিপদ," সুরথবাবুর কথায় সায় দিয়ে মন্মথবাবু বললেন, "এখন আমাদের একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত, কী করে পাগলা কুকুরের কামড় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।"

"বটেই তো," সুরথবাবু বলেন, "বলুন তো, এখন আমাদের লাইন অব অ্যাকশান কী হওয়া উচিত ?"

"আমি ভাবছি কী জানেন, যদি একটা বেশ বড় সিরিঞ্জ পাওয়া যেত, তা হলে চুপিচুপি দরজাটা একটু ফাঁক করে দিতাম ওটাকে একটা মোক্ষম ইনজেক্শন। এক ইনজেকশনে বাছাধন কাত।"

"আরে না মশাই, না। অত বড় সিরিঞ্জ পাবেন কোথায় ?"

একটু কোণঠাসা হয়ে মন্মথবাবু বলেন, "তা হলে আপনিই বলুন কী করা যায় ?"

"আমি বলি কি, ফায়ার ব্রিগেডকে একটা খবর দেওয়া যাক।"

"ফায়ার ব্রিগেড," মন্মথবাবুর মুখে বিস্ময়। "আগুন লাগলে তো লোকে ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দেয়।"

সুরথবাবু হেসে বলেন, "আরে মশাই, এখনকার যুগে ফায়ার ব্রিগেডই সব মুশকিলের আসান। হাওড়া পোলের ওপর লোক উঠেছে, ডাকো ফায়ার ব্রিগেডকে। কুয়োয় মানুষ পড়েছে, ডাকো ফায়ার ব্রিগেডকে। এমনকী, রাস্তায় পাগল দেখলেও লোকে ফায়ার ব্রিগেডে খবর দেয়।"

"বলেন কী ?"

"ঠিকই বলছি। তবে পুলিশেও একটা খবর দিতে হবে। কারণ পুলিশের জুরিসডিকশনে··· মানে আওতায় পড়ে এটা। আইন বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস মশাই।" সুরথবাবু আত্মতৃপ্তির হাসি হাসেন।

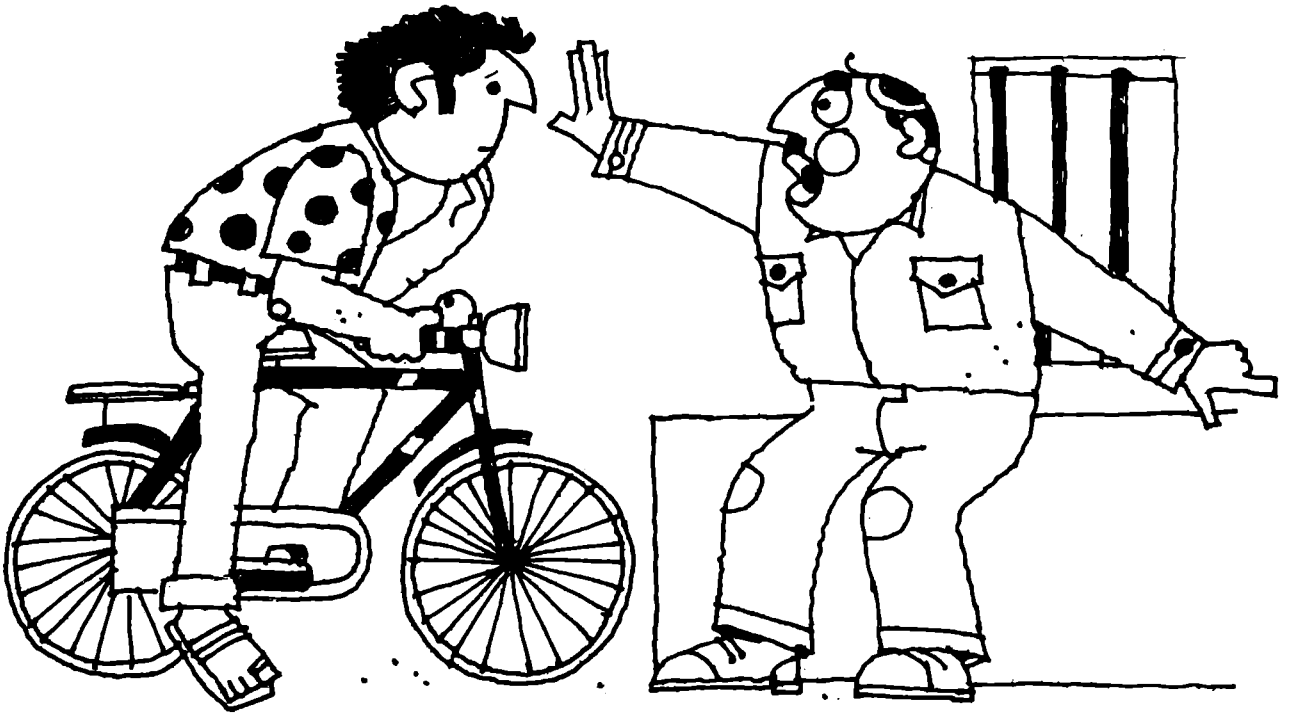

হাসিটা শেষ না-হতেই চেঁচিয়ে ওঠেন মন্মথবাবু, "দ্যাখো দ্যাখো, ছেলেটা করে কী ! ওরে বাঁচতে চাস তো পালা।"

নন্দ এদিকে আসছিল, মন্মথবাবুর আচমকা চিৎকারে ভয় পেয়ে সে লাফ মেরে গিয়ে উঠল পালেদের রকে। সেখান থেকে জিজ্ঞেস করলে, "কী হয়েছে জ্যাঠামশাই ?"

"ফ্যাসাদ হয়েছে। এখন আশপাশ থেকে ফায়ার ব্রিগেডকে একটা টেলিফোন করে দাও।"

নন্দ অবাক হয়ে যায়, "কেন জ্যাঠামশাই ? আগুন-টাগুন লেগেছে নাকি ?"

এবার চটে যান মন্মথবাবু। বলেন, "লেগেছে। তবে বাড়ি-ঘরে নয়, কপালে। বুদ্ধি বলে তো···।"

মন্মথবাবুর কথা শেষ হল না, চেঁচিয়ে উঠলেন সুরথবাবু, "স্টপ্। আর এক পা'ও এগিয়ো না কানাই।"

কানাই আসছিল সাইকেলে চেপে, থতমত খেয়ে থেমে পড়ল। একটা পা মাটিতে ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কেন সুরোকাকা, থামব কেন ?"

"থামবে না তো কি মরবে নাকি ?" সদর দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "দেখছ, কী রয়েছে ? সাক্ষাৎ যম। উলটোমুখো ঘুরে চটপট থানায় একটা খবর দিয়ে এসো।"

সুরথবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই 'গেল গেল' করে উঠলেন মন্মথবাবু। পালেদের মেজগিন্নি দরজা খুলে ফুলের সাজি হাতে সিঁড়ি বেয়ে নামছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়েই মন্মথবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "গেল গেল, এক্ষুনি সর্বনাশ হয়ে যাবে। যাবেন না, যাবেন না।"

হঠাৎ মন্মথবাবুর চিৎকার শুনে মেজগিন্নি প্রথমটা হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর তাড়াতাড়িতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়লেন।

মন্মথবাবু আবার 'গেল গেল' করে উঠলেন। নন্দ আর কানাই দৌড়ে এসে অতি কষ্টে মেজগিন্নিকে তুলে ধরে রকে শুইয়ে দিলে।

মন্মথবাবুর চিৎকার আর মেজগিন্নির মড়াকান্না শুনে বাড়ির ভেতর থেকে আরও অনেকে বেরিয়ে এল। এই দৃশ্য দেখেই তারা ছুটল পাখা আর জল আনতে।

দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল পালেদের রকে।

মেজগিন্নি চেঁচাচ্ছেন, "ওরে বাবা রে, গেছি রে। ভীষণ যন্ত্রণা। পায়ের হাড় বোধহয় ভেঙে গেছে।"

পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন মেজকর্তা। ভীতকণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, "অ্যাঁ, হাড় ভেঙে গেছে ! ওরে বাবা, কী কী রে বাবা !" মন্মথবাবুর উদ্দেশে হাতদুটো জোড় করে মিনতি জানান, "ও মন্মথবাবু, আসুন একবার দয়া করে। এই বিপদের সময় পুরনো ঝগড়ার কথা মনে রাখবেন না।"

মন্মথবাবু মুখে একটা আক্ষেপের শব্দ করে বলে উঠলেন, "না না, সে-সব কথা নয়। কথা হচ্ছে আপনার স্ত্রীর মতে আমি তো অতি বাজে ডাক্তার।"

মন্মথবাবুর কথা শেষ হল না, মেজগিন্নি পা ধরে উঠে দাঁড়ালেন। স্বামীর দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে উঠলেন, "বাজে ডাক্তারই তো। তা নইলে মানুর মেয়ের হয়েছে সর্দি, বলে কিনা নিউমোনিয়া। মেয়ে আমার শুনেই ভয়ে কাঠ। কিছু হয়নি আমার পায়ে," বলে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে চলে গেলেন ভেতরে।

সুরথবাবু মন্মথবাবুর হাঁড়ির মতো মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "ও মশাই, আপনার ওপর মেজগিন্নি যে ভারী খাপ্পা দেখছি।"

"কলি, কলি বুঝেছেন। ঘোর কলি। নইলে শীতের রাতে কাঁপতে-কাঁপতে গিয়ে ওষুধ দিলাম, তাই তো জ্বরটা আর বাঁকা পথ নিতে পারলে না। এখন তো বাজে ডাক্তার বলবেই।" মন্মথবাবুর বুকটা খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

সুরথবাবু বললেন, "যাক গে মশাই, ছেড়ে দিন ওসব কথা। বিদ্যাসাগর মশায়ের কথাটা মনে আছে তো ? উপকার করতে যাওয়াই পাপ, বুঝলেন। এই আমার কথাই ধরুন না। সুবিমলবাবুর পার্টিশনের কেসটা নামমাত্র টাকায় করে দিলাম।

সস্তা পাউডারগুলো ন্যাটের মত পরিস্কার তো করেই না, ভালো জামাকাপড় নষ্ট করে

ন্যাটের অনেক গুণ। তাই তো সুগৃহিণীর কাছে তার এত কদর। বিশেষ জার্মান পদ্ধতিতে তৈরি ন্যাট ডিটার্জেন্ট পাউডারের দানাগুলি হাল্কা অথচ ময়লা ধোওয়ার শক্তিতে ভরপুর। সেইজন্য ওজন অনুপাতে অনেক বেশি পাউডার আপনি পান। তাছাড়া সাধারণ পাউডারে যতটা সোডা-অ্যাশ থাকে ন্যাটে থাকে তার চেয়ে অনেক কম। ফলে জামাকাপড় নষ্ট হয় না কাপড়কাচা হাতও যত্নে থাকে। সাধে কি বলি– **এতটুকু ন্যাটের ছোঁয়ায় জামাকাপড়ের রূপ খুলে যায়।**

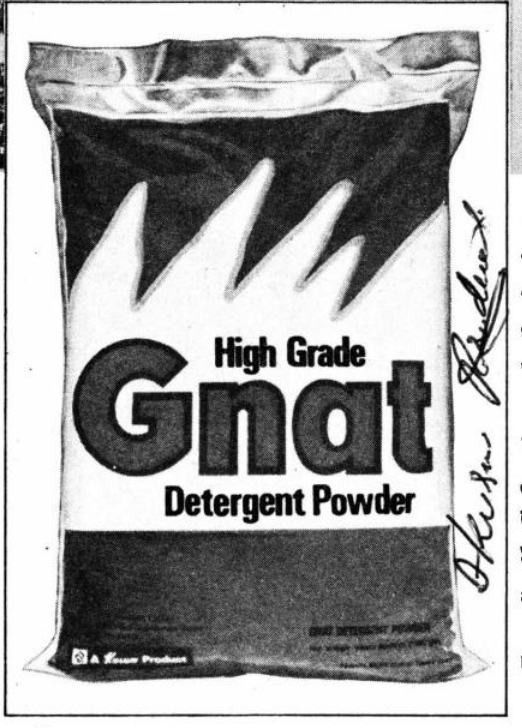

ন্যাট ৪০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি ও ২ কেজি প্যাকেটে পাওয়া যায়।

A Kusum Product আস্থার সঙ্গে কিনুন

GK&E.C85.43

এখন শুনি, উনি বলে বেড়ান, আমি নাকি বটতলার উকিল। নাকি ওঁকে ঠকিয়ে টাকা নিয়েছি, কেসটা ঠিকমতো করতে পারিনি !"

সুবিমলবাবু দু'জনেরই প্রতিবেশী, উপরন্তু সম্পর্কে মন্মথবাবুর ভায়রাভাই। তাই তিনি একটা ফোড়ন কেটে বলেন, "যাই বলুন সুরথবাবু, কেসটা সত্যিই ঠিকমতো সাজানো হয়নি। নইলে বাড়ির সামনের দিকটা সুবিমল পেল না কেন ?"

সুরথবাবুর মাথার ভেতরটা বোঁ-বোঁ করে উঠল মন্মথবাবুর কথা শুনে। মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু রাগ প্রকাশ না-করে তিনি বললেন, "দেখুন মন্মথবাবু, আপনি বাজে ডাক্তার কি না জানি না, তবে বুদ্ধিটা আপনার···"

চটে উঠলেন মন্মথবাবু, "অযথা রাগ করেন কেন ? সত্যি কথাটা সহ্য করতে পারেন না ?"

সুরথবাবুর স্ত্রী কী একটা কাজে ঘরের ভেতরে গিয়েছিলেন। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এসে মুখঝামটা দিয়ে বলে উঠলেন, "ওঃ, একেবারে যুধিষ্ঠির এসেছেন ! বলি এত সত্যের ঘটা ছিল কোথায়, যখন মিথ্যে মামলা সাজাবার জন্যে দু'বেলা এসে পায়ে মাথা খুঁড়তেন ?"

জ্যা-মুক্ত ধনুকের মতো টান-টান হয়ে দাঁড়ালেন মন্মথগৃহিণী, "কী, এত বড় কথা ! মুখ সামলে কথা বলবেন। আমরা যাব পায়ে ধরতে ! আমার বাবার নামে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেত, আমার শ্বশুর ছিলেন ডাকসাইটে বড়বাবু, আমরা যাব একটা বটতলার উকিলের পায়ে ধরতে !" স্বামীর কনুইয়ে একটা ঠেলা মেরে বললেন, "চলে এসো ভেতরে। কথা কইতে হবে না ওদের সঙ্গে।"

নীচের দিকে আঙুল দেখিয়ে হতাশার সুরে বললেন মন্মথবাবু, "যাব তো··· কিন্তু ওটা যে নড়ছে না।"

ঝাঁজিয়ে উঠলেন মন্মথগৃহিণী, "ওটা তো রয়েছে ওদের দোরগোড়ায়, তাতে তোমার কী ?"

কাষ্ঠহাসি হেসে মন্মথবাবু বললেন, "ওটা হচ্ছে সংক্রামক ব্যাধির মতো। যতক্ষণ না পাড়া থেকে বিদেয় হচ্ছে, ততক্ষণ কারও নিষ্কৃতি নেই।"

কুকুরটা এই সময় ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। মন্মথবাবু আর সুরথবাবু একই সময় বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে দেখলেন নীচের দিকে। ঘাড় তুলতেই চোখাচোখি হল দু'জনের। মন্মথ এবং সুরথগৃহিণীও চাইলেন পরস্পরের মুখের দিকে। কেউই কথা বলছেন না, সকলেই ভাবছেন কে আগে কথা বলে। একটু আগে যে ঘটনা ঘটে গেল তাতে যেচে কথা বলা সহজ নয়।

আবার কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। এবার একটু জোরে।

মন্মথবাবু এবং সুরথবাবু দু'জনেই ভয়ে শিউরে উঠলেন।

এই সময় চেঁচিয়ে উঠলেন সুরথবাবু, "দেখুন মন্মথবাবু, পালেদের রকে লোক জমে গেছে।"

সুরথবাবু উপযাচক হয়ে কথা বলায় মন্মথবাবুর মুখটা বেশ প্রফুল্ল দেখাল। বললেন, "যাবেই তো, পাগলা কুকুর নিয়ে কথা। মৃত্যুভয়, মশাই, মৃত্যুভয়। জলাতঙ্ক, আঠারো বছর ধরে চলতে পারে তার জের। আমার নিজের চোখে দেখা।"

কুকুরটা এই সময় উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। দু-একবার উঠল, আবার কাঁপতে-কাঁপতে বসে পড়ল।

মন্মথবাবু এবং সুরথবাবু একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই, খুব সাবধান তোমরা। এইবার তেড়ে যাবার চেষ্টা করছে।"

মন্মথবাবু চেঁচান, "এই, ভেতরে ঢুকে যাও।"

সুরথবাবু বলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ছাদে উঠে যাও। চেঁচিয়ে লোক জড়ো করো। রিইনফোরস্‌মেন্ট দরকার।"

"টেলিফোন, ফায়ার ব্রিগেড, ইমিডিয়েট," মন্মথবাবুর গলা সুরথবাবুর গলা ছাপিয়ে ওঠে।

সুরথবাবুও দমবার পাত্র নন, এবার তাঁর গলা ওঠে সপ্তমে, "পুলিশ, পুলিশ, প্রেফারেবলি আর্মড পুলিশ।"

চিৎকারের প্রতিযোগিতার মধ্যে গলির মোড়ে দেখা গেল গোবিন্দকে। গোবিন্দ ঝাড়ুদার, এ পাড়াটা তার চার্জে।

গোবিন্দকে দেখেও মন্মথবাবু আর সুরথবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই গোবিন্দর নজর পড়ে গেল কুকুরটার দিকে। ছুটে এসেই কুকুরটাকে বুকে জড়িয়ে ধরল সে। তারপর তার গায়ে-মাথায়-মুখে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললে, "আরে দুখিয়া, কাল থেকে তোকে খুঁজছি। তুই এখানে বসে আছিস !"

কুকুরটাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল। কিন্তু কুকুরটা দাঁড়াতে পারল না। কাঁপতে-কাঁপতে বসে পড়ল। গোবিন্দ কুকুরটাকে ভাল করে একবার দেখে নিয়ে কপাল চাপড়াতে-চাপড়াতে বললে, "আরে বাপ, কোন্ বদমাশ তোর পা ভেঙে দিয়েছে ! হায় ভগবান !"

কুকুরটাকে সে তুলে নিলে কাঁধের ওপর।

মন্মথবাবু আর সুরথবাবু একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, তারপর চাইলেন নীচের দিকে। দেখলেন, কুকুরটা পরম আনন্দে গোবিন্দর কাঁধে শুয়ে আছে, আর গোবিন্দ ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলছে, "চল্, ওষুধ লাগিয়ে দেব। কাল থেকে যোগিয়ার মা তোর জন্যে কাঁদছে। কিচ্ছু খায়নি।"

গোবিন্দ গলির মোড় পার হয়ে চলে গেল। মন্মথগৃহিণী আর সুরথগৃহিণী পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। মন্মথবাবু আর সুরথবাবু মুখোমুখি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন বারান্দার রেলিং ধরে।

ছবি : দেবাশিস দেব

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব হৈ হৈ কাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

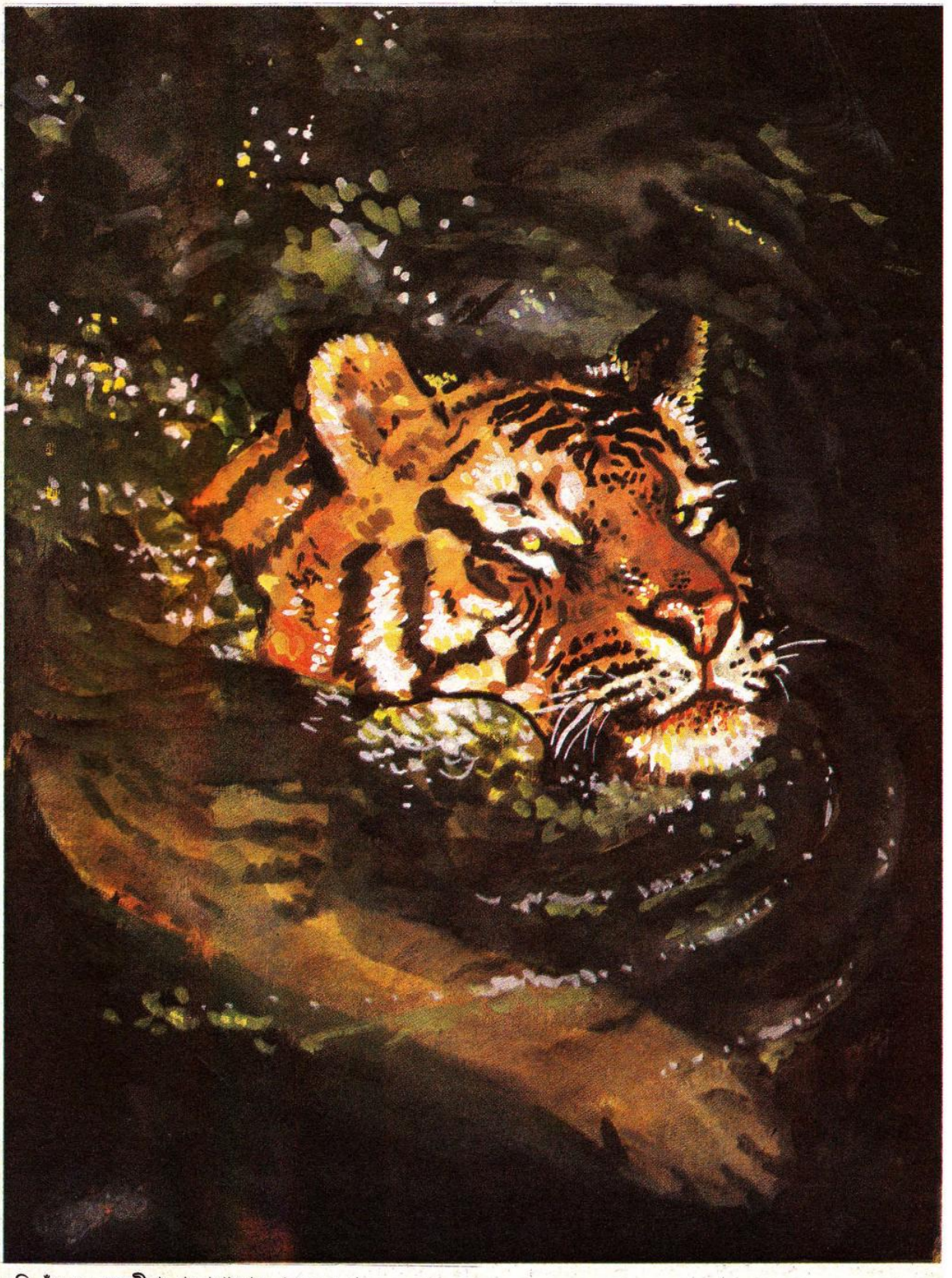

ছবি এঁকেছে **জয়দীপ গঙ্গোপাধ্যায়** (বয়স ১৫)

বিগত বইমেলায় প্রকাশিত তোমাদের কয়েকটি বই

পুণ্যলতা চক্রবর্তীর

খুব ছোট্টদের মনের মতো

ছোট্ট ছোট্ট গল্প

ছবি ॥ সত্যজিৎ রায় দাম ১৫·০০

খুব ছোট্ট যারা, সবে যারা অক্ষর চিনেছে, যাদের গল্পের খিদে অনন্ত—ঠিক তাদের উপযোগী গল্পের বই বেশী নেই। সেই অভাবই মেটাবে এই অসাধারণ গ্রন্থ।

ছোটদের জন্য লেখা কঠিন, ছোট্টদের জন্য কঠিনতর। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা এবং সুকুমার রায়ের সহোদরা পুণ্যলতা চক্রবর্তীর রক্তের মধ্যেই রয়েছে ছোটদের বশ করবার এক ঐতিহ্যের বীজ। তাই বুঝি তিনি এমন কঠিনতর কাজ এমন নিপুণভাবে নিষ্পন্ন করতে পেরেছেন।

এ-বইয়ের গল্পগুলি ছোট্ট, সহজ, সরস, স্বাদু। তাদের জন্য লেখা, যারা সবে পড়তে শিখেছে, এমনভাবে লেখা যাতে তারা আরও ভালোভাবে পড়তে শেখে। ছোটদের নিজস্ব জগতের অধিবাসীরাই এ-বইয়ের একেকটি গল্পে নানা চরিত্র-রূপে এসেছে। হাঁস, মুরগী, কুকুর, বেড়াল, কাঠবেড়ালী, ব্যাঙ, ইঁদুরছানা, হরিণ, টিয়া—এমন সব্বাইকে নিয়ে দুরন্ত সব গল্প। সেইসঙ্গে রয়েছে চোখ-জুড়োনো ছবি, সত্যজিৎ রায়ের আঁকা।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের

স্মরণীয় ছড়া-সংকলন

মিষ্টি কথায় বিষ্টিতে নয়

দাম ২০·০০

শব্দের পিঠে বরাবরই এক দৃপ্ত সওয়ার শক্তি চট্টোপাধ্যায়। এবার তাঁর বিজয়-অভিযান ছোটদের কানের রাজ্যে, তাদের প্রাণের রাজ্যে। চলার দমকে জেগেছে চমক, উড়েছে অর্থ-ধ্বনির ধুলো, সেই ধুলো-ওড়ানো রঙীন পথ বেয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় চলেছেন ছড়ার ভখণ্ড জয় করতে করতে। তাঁর স্মরণীয় সত্তরটি ছড়া নিয়ে এই সংকলন। কখনও লৌকিক ছড়ার গড়নে নতুন সৃষ্টি, কখনও নতুন গড়নে অলৌকিককে ধরার চেষ্টা। অপ্রত্যাশিত মিলের চারুতা, অপ্রচলিত ছন্দের কারুতা। তেমনই বিস্ময়কর সব বিষয়। সহজ, গভীর, মজাদার চিত্রময়। সংহত, শ্রুতিসুখকর ও স্মৃতিধার্য এইসব ছড়ার সঙ্গে আরেক বিস্ময়কর সংযোজন—অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের পাতা-জোড়া-জোড়া লিনোকাট ছবি। যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের যোজনায়, অভাবনীয়ের সঙ্গে অসামান্যের সম্মিলনে দ্বিগুণ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এই বই। প্রচ্ছদ : অরুণ চট্টোপাধ্যায়।

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কৌতূহল-মেটানো গ্রন্থ

ধূমকেতু-রহস্য ও হ্যালি

দাম ১২·০০

ছিয়াত্তর বছর পরে হ্যালির ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাব নিয়ে সারা বিশ্ব যখন তুমুলভাবে আলোড়িত, ঠিক সেই সময় এগিয়ে এলেন এমন-এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী, সংশ্লিষ্ট বিষয় যাঁর করতলধৃত আমলকী।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে সারা ভারতের অদ্বিতীয় কেন্দ্রর—যে কেন্দ্র সমগ্র বিশ্বের আটটি কেন্দ্রর অন্যতম—অধিকর্তা অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। আসন্ন এই ধূমকেতুকে কেন্দ্র করে যত জিজ্ঞাসা এবং প্রাসঙ্গিক যত কৌতূহল—সব কিছুরই বিজ্ঞানসম্মত জবাব তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর এই গ্রন্থে।

ধূমকেতুকে যে অমঙ্গল ও দুর্ঘটনার অগ্রদূত বলে মনে করেন অনেকে, তার পিছনে কোনও বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে কিনা, একদিকে তা নিয়ে যেমন, অন্যদিকে, দুর্লভ এই ধূমকেতুকে —সারা জীবনে একবারই যাকে দেখার সুযোগ আসে মানুষের—এবার কীভাবে খালি চোখে সবথেকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করা সম্ভব, কীভাবে ক্যামেরায় ধরে রাখা যাবে এই বিরল অভিজ্ঞতাকে, তা নিয়েও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বিস্তারিত আলোচনা এ-গ্রন্থের অন্যতম সম্পদ। ধূমকেতুর কিছু দুষ্প্রাপ্য ছবি ও রেখাচিত্র এ-বইয়ের আলাদা আকর্ষণ।

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

বিগত বইমেলায় প্রকাশিত তোমাদের আরও কয়েকটি বইয়ের বিজ্ঞাপন পরবর্তী সংখ্যায়।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩৪৪৩৬২

ভূতবিক্রয়-কেন্দ্র

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

লাটুবাবু এ-গাঁয়ের এমন একজন মানুষ, যাঁর কাছে টাকা ধার চাইলেই পাওয়া যায়। লাটুবাবু কাউকে ফেরান না। তবে, ধার দেওয়ার আগে কিছু-না-কিছু বন্ধক রেখে টাকা দেন। সোনাদানা, হার, আংটি, যদি এসব না থাকে, তা হলে পেতলের থালা, গেলাস, কলসি জমা রেখে টাকা ধার দেন। ধারের জন্যে মাসে দশ টাকা হারে সুদ দিতে হয়। বিপদে-আপদে লাটুবাবু গাঁয়ের মানুষের সহায়।

হলে কী হবে, ধার নেওয়ার সময় তারা বলে, লাটুবাবু তাদের মা-বাপ। তাঁর পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ে। আর মাস ফুরোলে সুদের টাকাটা দেবার বেলায় লাটুবাবুকে কেউ চিনতেই পারে না। সুদের টাকা আদায়ের জন্য সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত লাটুবাবুকে ওদের পিছন-পিছন ঘুরতে হয়। যারা টাকা ধার নেয়, তারা দূর থেকে যদি একবার লাটুবাবুকে দেখতে পায়, অমনি দে ছুট। শুধু কী তাই, পালিয়ে গিয়ে লাটুবাবুর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়!

এজন্যে লাটুবাবুর খুব দুঃখ হয়। রাগও করেন। সেবার হারাধন, লাটুবাবুকে দেখে ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে খাটের নীচে লুকিয়ে পড়ল। আর বউকে বলল বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে দিতে।

হারাধনের বউ যখন তালা লাগাবে, তখন লাটুবাবু দরজার গোড়ায় পৌঁছে গেছেন। হারাধনের বউকে বললেন, "এ কী করছ? কর্তাকে ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে তালা দিচ্ছ কেন? আমি কি কিছুই দেখিনি?"

এইভাবে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে টাকা আদায় করতে হয় লাটুবাবুকে। না করলেই বা তাঁর চলে কী করে!

লাটুবাবুর বাবা বলতেন, "বুঝলি লাটু, পাওনা টাকা ছেড়ে দিতে নেই। আদায় করে নিতে হয়। না হলে লোকে বোকা ভাবে।" লাটুবাবু বোকা বনতে চান না। সুদের টাকা তাঁর পাওনা টাকা।

সংসারে একা মানুষ। ছিল একটা বউ। মরে গেছে। বউটা লাটুবাবুর থেকে বয়সে অনেক ছোট ছিল। বুদ্ধিশুদ্ধি বলতে কিছু ছিল না। সংসারের কাজে যেমন খাটত, তেমনি খাওয়ার দিকে লক্ষ ছিল। বউয়ের নজরের চেয়ে লাটুবাবুর নজর ঢের বেশি। খাওয়ার ব্যাপারে বউয়ের বোকামো তিনি একদম সহ্য করতেন না। কখনও বেশি খেতে দিতেন না। বলতেন, 'বেশি খেলে কী হয়, জানো? আয়ু কমে যায়।' বউয়ের আয়ু কমে যাক, এটা মোটেই ভাল কথা নয়। এজন্যে লাটুবাবু বউকে প্রায়ই একবেলা আধপেটা খেতে দিতেন। না খেতে পেয়েই বউটা মরে গেল।

লাটুবাবু ছেলেপুলে এক্কেবারে পছন্দ করেন না। নেই, ভালই হয়েছে। লাটুবাবু বলেন, কী হয় ওসব দিয়ে? থাকলে দু'বেলা শুধু তাঁর অন্ন ধ্বংস করত। দেশের পক্ষে অন্ন বড় মূল্যবান দ্রব্য। ধ্বংসের জন্যে নয়।

লাটুবাবুর ঘরে দেয়াল-ভর্তি দেবদেবীর ছবি। কোথাও একখানা ছবির দেবতা পেলেই কপালে ঠেকিয়ে নিয়ে এসে দেয়ালের ভাঙা জায়গায় ঝুলিয়ে দেন। দেবদেবীদের প্রণাম করলেই হয়। আর, দিনে একখানা ছোট লাল বাতাসা ভেঙে সবাইকে ভাগ করে দিলেই দেবতারা খুশি থাকেন। ওইটুকু না দিলেও তাঁরা কিছু মনে করেন না। দেবতারা সবাইকে সন্তানস্নেহে ক্ষমা করেন।

অথচ, এ-জন্যে লোকের শ্রদ্ধাভক্তি পাওয়া যায়। লাটুবাবুকে গাঁয়ের লোক সাধক, ভক্ত বলেন। বাড়তি ভক্তিশ্রদ্ধা পাওয়ার জন্যে লাটুবাবু কপালে বড় করে গঙ্গামাটির তিলক কাটেন।

সেদিন বেলা পড়ে এসেছে। টাকা সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরছেন লাটুবাবু। সারাদিন ঘুরলেও আদায়টা ভাল হয়েছে। মেজাজ ফুরফুরে। লাটুবাবুর শরীরে কোথাও যে গানের সুর আছে, লাটুবাবু নিজেই তা জানতেন না। ভিতর থেকে লাটুবাবুর অজান্তে গুনগুনিয়ে একটি মিষ্টি সুর বেরিয়ে আসার জন্য আকপাক করছিল, তিনি ঠোঁট না খুললেও নাক দিয়ে বেরিয়ে এল। এই সঙ্গীতপ্রবাহে লাটুবাবু নিজেই একটু অবাক হয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি তাকিয়ে দেখে নিলেন, কাছাকাছি কেউ আছে কি না। দেখলেন, না, কেউ নেই।

এমনি ফুরফুরে মেজাজে হাঁটতে হাঁটতে একটি দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দোকানের দেয়ালে ছোট একটি সাইনবোর্ড। বিচিত্র বিজ্ঞাপন।

এখানে ভূত বিক্রয় হয়
ঘরের যাবতীয় কাজের জন্যে
সস্তায় মাটির দামে খাঁটি ভূত পাবেন

আরও লেখা—পরীক্ষা প্রার্থনীয়। নকল প্রমাণে টাকা ফেরত।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পথঘাট নির্জন। কাছাকাছি কোনও লোকজন নেই। এ-অবস্থায় ভূতের নাম শুনলেও গা ছমছম করে। সেই ভূত আবার কিনতে পাওয়া যায়? লাটুবাবু জীবনে কখনও শোনেননি। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনও রহস্য আছে। দোকানটি তো ত্রৈলোক্যনাথের। আলু-পেঁয়াজ বিক্রি করে। দোকানের মধ্যে ঢুকলেন লাটুবাবু। ভিতরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভূতটুত কিছুই দেখতে পেলেন না। যাঁকে দেখলেন তিনি ত্রৈলোক্যনাথ। ত্রৈলোক্যনাথ বামুনের ছেলে। পৈতেটা বুকে-পেটে আড়াআড়ি করে রাখেন। মুখের ওপর যা চোখে পড়ে, তা দু'দিকে দুটি লম্বা গোঁফ। দেখলেই বোঝা যায়, গোঁফজোড়া বড় শখের। আদরযত্নে বড় হচ্ছে।

"কী ব্যাপার হে ত্রৈলোক্যনাথ, আলু-পেঁয়াজের সঙ্গে আবার ভুতুড়ে কারবার জুড়ে দিলে নাকি?"

ত্রৈলোক্যনাথ মুখ কাঁচুমাচু করে এগিয়ে এসে বসতে বললেন লাটুবাবুকে। তারপর বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "ভুতুড়ে কারবার নয় লাটুবাবু। ভূত কেনা-বেচার কারবার আর কি। একজনের থেকে কিনি, আর-একজনের কাছে বেচি।"

"একজনের কাঁধ থেকে নামিয়ে আর-একজনের কাঁধে চাপাও?"

"না লাটুবাবু। এ-ভূত কারও কাঁধে চাপে না। নিজের পায়ে হাঁটে। লোকের বাড়িতে কাজকর্ম করে। মুখে কথাটি বলে না। মুখ বুজে ঘাড় গুঁজে চোখের নিমেষে কাজ করে ফেলে। বড় কথা, একে খেতেও দিতে হয় না।"

"এ ভূত খায় না? মাছটাছ?"

"কিচ্ছু খায় না। তবে, আপনি ধর্মপ্রাণ মানুষ। আপনার খাওয়ার পর পাতের পাশে এঁটোকাঁটা যা পড়ে থাকবে, কুকুর বেড়ালকে যা দিয়ে থাকেন, সেটুকু ওকে দিতে পারেন। ওতেই চলবে। না দিলেও চলবে।"

"বলো কী ত্রৈলোক্যনাথ। কথার বাধ্য হবে তো?"

"কথার বাধ্য মানে? একবার কিনলে ও আপনার গোলাম। অবাধ্য হলে ওর পিঠের ছাল তুলে নেবেন।"

"ভূতের ছাল আছে?"

"ওইটুকুই আছে।"

"যদি কখনও আমার খাওয়া দেখে তাকিয়ে থাকে? লোভী-লোভী চোখে তাকায়?"

"হাড় গুঁড়িয়ে দেবেন।"

"হাড়ও আছে?"

"ওই হাড়ের ওপর ছালটুকুই। আর কিছু না। রাতে আপনার বাড়ি পাহারা দেবে। কোনও চোর-ডাকাতের কম্মো নয় আর আপনার বাড়ির সীমানায় ঢোকে। একেবারে ঘাড় মটকে দেবে। চোরের ঘাড় দেখলেই ও চিনতে পারে, মটকে দেবে। দারুণ শক্তি ওর দু'হাতের আঙুলে।"

"তা হলে, আমারও ঘাড় মটকাতে পারে?"

"আপনি যখনই ওর মালিক, তখন তো ওর নিজের ইচ্ছেয় বা অন্যের ইচ্ছেয় কিছু করতে পারবে না। ভূত বড় বিশ্বাসী। আপনি ওকে একবার বলে দেবেন কার ঘাড় ভাঙতে হবে, রাতের অন্ধকারে তার ঘাড় ভেঙে দিয়ে চলে আসবে। কাকপক্ষীও টের পাবে না।"

ত্রৈলোক্যনাথের কথা শুনতে শুনতে লাটুবাবুর মাথার মধ্যে অনেক চিন্তা এসে জট পাকাতে লাগল। বাড়িঘর দেখাশোনার জন্যে, কাজের জন্যেও বটে, একটা মানুষ দরকার। মানুষ রাখলে সে তো খেয়েই শেষ করে দেবে। বউটা মরে একটু অসুবিধেয় ফেলেছে। বাড়িঘরের কাজ তো কম নয়। রান্নাবান্না, বাড়ি পাহারা দেওয়া। তা ছাড়া, টাকা আদায় করতে গেলে মানুষগুলো যেভাবে তাঁকে ভোগায়! এ-রকম একটি আজব জিনিস বাড়ি থাকলে তাদেরও বেশ জব্দ করা যাবে।

"তা তোমার ভূতের জন্যে কত দাম দিতে হবে?"

"দাম নিয়ে ভাববেন না লাটুবাবু," গলার স্বর নিচু করে বললেন ত্রৈলোক্য, "চার-পাঁচশো টাকায়ও বেচে থাকি। আপনার ক্ষেত্রে আলাদা কথা। এখন আমার হাতে একটা বিলিতি ভূত আছে। সাইজে ছোটখাটো। রঙটাও ভাল, কালো কুচকুচে।" লাটুবাবুর কানের কাছে মুখ এনে ত্রৈলোক্য এমন ভাবে বললেন, যেন কেউ শুনতে পেলে এক্ষুনি বেশি দাম দিয়ে ওটিকে হাতিয়ে নিয়ে যাবে।

লাটুবাবুরও খুব মনে ধরেছে। কাজ করবে, খাবে না। এর পিছনে কোনও খরচ-খরচা নেই। যা দিতে হবে, একবার মাত্র।

ত্রৈলোক্য বললেন, "আপনার বাড়িতে ছেঁড়া গামছা আছে তো?"

"তা আছে।"

"এ বছরে ছিঁড়ে আধখানা দেবেন। ও বছরে বাকি আধখানা পরতে দেবেন। না দিলেও চলবে।"

মনে মনে খুশি হন লাটুবাবু। তবে, ওই ঘাড় মটকানোর ব্যাপারে মনের মধ্যে একটু খচখচ করে। আবার জিজ্ঞেস করেন ত্রৈলোক্যকে, "রাতের অন্ধকারে আমিও মাঝে-মাঝে উঠি কিনা।"

"ও তো আপনার ভূত। কেনা ভূত। ভূত কখনও বেইমান হয় না।"

"চোর না হয়ে রাতে যদি অন্য কেউ আসে? তারও ঘাড়…"

"না, প্রথমেই ঘাড় মটকাবে না। কামড়ে দেবে। হাতে কি পায়ে কামড়াবে। ওর দাঁত কুকুরের থেকেও শক্ত। ওই তো আমার দোকান পাহারা দেয়। আমি তো দরজা বন্ধ করি না। তা, আপনি বলে দেবেন। যাকে কামড়াতে বলবেন, তাকেই কামড়ে দেবে।"

মনে-মনে আবার ভাবেন, এই জিনিসটাই তাঁর দরকার। সুদের টাকা চাইলে কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার মজা এবার দেখাবে। মুখে বললেন, "দ্যাখো ত্রৈলোক্য, ভূতের আমার দরকার নেই। তবে তুমি বলছ যখন, নিতে পারি। কত দিতে হবে ঠিকঠাক বলো।"

"দামাদামি করে এ-জিনিস কিন্তু কখনও পাবেন না। আপনি কিনতে পারবেন না। তবে, আপনার জন্যে বলছি, এখন একশো টাকা দিয়ে নিতে পারেন। বাকি দুশো টাকা মাসে-মাসে দেবেন। বাকি টাকার জন্যে সুদ দিতে হবে না, এটুকু করতে পারি।"

দরাদরি না করে লাটুবাবু কিছু কিনতে পারেন না। দরাদরি না করলেই তিনি মনে করেন, ঠকে যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত আড়াইশো টাকায় রফা হল। লাটুবাবু আগাম পঞ্চাশ টাকা দেবেন। ভূত নিয়ে যাবেন। বাকি টাকা মাসে-মাসে দেবেন।

যাকে নিয়ে এত দর-কষাকষি, তাকে কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ এখনও বার করেননি।

সন্ধে হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথ একটি প্রদীপ জ্বাললেন। প্রদীপের মিটমিটে আলোয় দোকানের ভিতরে কিছুই দেখা যায় না। ত্রৈলোক্য লাটুবাবুকে দোকানে বসিয়ে ভিতরের দরজা খুলে কোথায় চলে গেলেন। লাটুবাবুকে বলে গেলেন, "একটু বসুন। এক্ষুনি আসছি।"

কিছুক্ষণ পরে ত্রৈলোক্য ভিতরের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। কাকে যেন বললেন, "যা ওইখানে বোস্। এখন থেকে তুই লাটুবাবুর। লাটুবাবু তোর মালিক। লাটুবাবু যখন যা বলবেন, তাই করবি। নিজের ইচ্ছেমতো কিছু করবি না। কথা না শুনলে লাটুবাবু তোর ছাল তুলে নেবে, হাড় গুঁড়িয়ে দেবে। মনে থাকে যেন।" ত্রৈলোক্য লাটুবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখুন, যা বলেছি ঠিক কি না। রাত্রে যখন আপনার বাড়ি পাহারা দেবে, ওকে কেউ দেখতে পাবে না। আপনি দেখতে পাচ্ছেন?"

লাটুবাবু কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। ঘরের কোণে থিকথিকে ঘন অন্ধকারই শুধু দেখছেন। নিরেট অন্ধকার। অন্ধকারে দুটো চোখ, বোধহয় ও-দুটো ভূতের চোখ, জ্বলছে।

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লাটুবাবুর শরীরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। কী করবেন, স্থির করতে পারছেন না। এ যদি তাঁকেই কামড়ে দেয়? তাঁরই ঘাড় মটকে দেয়? কিন্তু, এত কথার পর এখন না কিনলে…। ত্রৈলোক্য আলুর আড়ালে ভূতের কারবার করেন, তিনি যদি তাঁর পিছনেই ভূত লেলিয়ে দেন? তখন তাঁকে বাঁচাবে কে? ত্রৈলোক্য তো আর বাঁচাবেন না। তিনিই তো লেলিয়ে দেবেন। এখন তো ওটা ত্রৈলোক্যর। না, ওটাকে নিতেই হবে। ভূতকে পোষ মানাতে পারলে তাকে দিয়ে অসাধ্য সাধন করা যাবে। ভূতই তাঁর সহায় হবে। মনে-মনে সাহস সঞ্চয় করেন লাটুবাবু। লাটুবাবু পঞ্চাশ টাকার একটা নোট

ত্রৈলোক্যর দিকে এগিয়ে ধরলেন। ত্রৈলোক্য ছোঁ মেরে টাকাটা নিয়ে নিজের কোমরে গুঁজে ফেললেন।

"এদিকে আয় কেলো। ওকে কেলো বলে ডাকবেন। বাবুর সঙ্গে চলে যা। এদিকে আর ফিরে তাকাবি না। এখন থেকে লাটুবাবুই তোর সব।"

কেলো কী বুঝল সেই জানে। লাটুবাবুর চোখে শুধুই অন্ধকার।

লাটুবাবু বাড়ি চললেন। পিছনে-পিছনে একদলা অন্ধকার হেঁটে চলল। অন্ধকারের পায়ে কোনও শব্দ নেই। শুধু দুটো চোখ। জ্বলজ্বল করছে। লাটুবাবু আর পিছনে তাকাতে পারেন না।

ত্রৈলোক্যনাথ কিছু মিথ্যে বলেননি।

কেলোকে যে কাজই দেওয়া হোক, চোখের পলকে সব করে ফেলে। সারারাত বাড়ি পাহারা দেয়। মুখে কোনও রা নেই। কয়েক দিনের মধ্যেই লাটুবাবু কেলোকে বুঝে নিয়েছেন। কেলো খুব কাজের। বিশ্বাসী।

লাটুবাবু সকালবেলা বগলে একখানা খাতা নিয়ে বেরিয়ে যান। ফেরেন অনেক বেলায়। কেলো রান্না করে, ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে রাখে। লাটুবাবুর কথার এদিক-ওদিক করে না। দিনের শেষে লাটুবাবুর খাওয়ার পর পাতের পাশে এঁটোকাঁটা-জড়ানো ভাতটাত যা পড়ে থাকে, কেলোকে তাই খেতে দেওয়া হয়। কেলো তাই গোগ্রাসে গেলে। এমন গেলা লাটুবাবু কখনও দেখেননি। দেখে গা জ্বলে যায়।

লাটুবাবুর অনেক দিনের একটা অভ্যেস আছে। রাতে ঘুমের আগে তাঁর চুলের মধ্যে চিরুনি বুলিয়ে বউ ঘুম পাড়াত। খুব আস্তে, আলতোভাবে, যেন বোঝাই যাবে না। বউ মরে যাওয়ার পর এটা বন্ধ হয়ে গেছে। লাটুবাবু কেলোকে শিখিয়ে দিলেন। কেলোর চিরুনির দরকার হয় না। সরু আঙুলগুলো পিপড়ে হয়ে চুলের গোড়ায় গোড়ায় সুড়সুড়ি দেয়। চিরুনির থেকেও আরাম। লাটুবাবু ঘুমিয়ে পড়েন। কেলো বাড়ির বাইরে চলে যায় পাহারা দিতে। লাটুবাবু বলে দিয়েছেন কেলোকে, 'কাউকে দেখলেই কামড়ে দিবি না বা ঘাড় মটকে দিবি না।' কেলো লাটুবাবুর একান্ত বাধ্য হয়ে উঠেছে।

এক মাসের জায়গায় দু' মাস হয়ে গেছে। লাটুবাবু ত্রৈলোক্যর দোকান যে রাস্তায় সেদিকে আর যান না। এখন গেলে ত্রৈলোক্যকে দু'মাসের টাকা একসঙ্গে দিতে হবে।

গাঁয়েই, দূরের এক বাড়িতে লাটুবাবুর রাতের খাওয়ার নিমন্ত্রণ এল। রাতে নিমন্ত্রণ পেলে, বাড়িতে দিনে কিছু খান না। অন্যের বাড়িতে হলে লাটুবাবুর খাওয়াটাও একটু বেশি হয়ে যায়। সেদিনও বেশি হয়েছিল। প্রচুর মাছ, দই, মিষ্টি, ঢেলে খাইয়েছে। পরের বাড়ির খাওয়া, লাটুবাবু গলা পর্যন্ত খেয়ে এসেছেন। এমন খাওয়া মানুষে খাওয়াতেই ভুলে গেছে।

আজ আর লাটুবাবুর মাথায় কেলোর আঙুলগুলোকে পিপড়ে হয়ে হাঁটতে হল না। বিছানায় শুয়েই পট করে ঘুমিয়ে পড়লেন।

লাটুবাবুর ঘরে অনেক টাকা, সোনা, গয়না। সবকিছু তিনি আলমারিতেও রাখেন না। পুরনো আমলের বহু গয়না, ওজন করলে কয়েক কেজি হবে, তাঁর ঘরের মেঝেয় মাটির কলসিতে পুঁতে রেখেছেন। সেই কলসি তাঁর খাটের তলায়। বন্ধক রাখা সোনাদানা। কাউকে ফেরত দিতে হয় না। সুদ দিতে-দিতেই সবাই অক্কা পায়। সোনাদানা তিনি বেচেন না। তিনি জানেন, সোনার দাম কোনওদিন কমবে না। সোনার দাম শুধু বেড়েই যাবে।

সারা রাত লাটুবাবু বেঘোরে ঘুমিয়েছেন। রাত যখন ফুরিয়ে এসেছে, তিনি স্বপ্ন দেখছেন, বোধহয় স্বপ্ন। কেলোর মতো কালো থিকথিকে অনেক ভূত তাঁর ঘরের মধ্যে। অনেকগুলি ভূত তাঁকে চেপে বসে আছে। তাঁর গলায় অনেকগুলো কালো পাথরের সরু-সরু আঙুল। দম বন্ধ হয়ে আসছে। নড়তে পারছেন না। ঘামছেন। এত ভূত কোত্থেকে এল! ঘরভর্তি অনেক জ্বলন্ত চোখ। লাটুবাবুর দিকে তাকিয়ে আছে।

ঘুম ভাঙতে চোখ কচলে তাকালেন। কোথাও কোনও ভূত দেখতে পেলেন না। কেলোকেও না। ভয়ে উঠতেও পারছেন না। খাটের সঙ্গে শরীর এঁটে গেছে। গলা দিয়ে আওয়াজও বেরুচ্ছে না। রাত্রে অত মাছ, দই, মিষ্টি খাওয়া ঠিক হয়নি। পেট গরম হয়ে গেছে। তাই এইসব বাজে স্বপ্ন দেখেছেন। শুয়ে শুয়ে ভাবছেন লাটুবাবু।

একটু পরেই চোখে পড়ল তাঁর ঘরের দরজা খোলা। ভোর হয়ে এসেছে। কেলো কি বাইরে এখনও পাহারা দিচ্ছে? কেলোকে ডাকলেন। কেলোর কোনও সাড়াশব্দ নেই। কেলো কখনও সাড়া দেয় না। চলে আসে। কেলো এত ডাকাডাকিতেও এল না। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। উঠেই চোখে পড়ল, মাথার কাছে আলমারিটা হাঁ হয়ে আছে। ভিতরে কিছু নেই।

খাটের নীচে উপুড় হয়ে ঢুকে পড়লেন। সেখানে মাটি নেই। কারা খুবলে নিয়েছে। ভিতরে কলসির মুখ দেখা যাচ্ছে। হাত গলিয়ে দিলেন। ভেতরে জল আর গোবর। সোনাদানা সব গোবর-জল হয়ে গেল?

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস হুহু করে ঘরের মধ্যে ছুটে আসছে। লাটুবাবুর শীত করছে না। তিনি ক্রমশ ঘামছেন। দু'চোখে ভোরের আলো দেখতে পাচ্ছেন না। শুধু অন্ধকার। চারদিকে কেলোকে খুঁজতে লাগলেন। কোথাও কেলো নেই। হাতের কাছে পেলে ওর ছাল তুলে নেবেন, হাড় গুঁড়িয়ে দেবেন। কিন্তু কোথায় কেলো। ছুটলেন ত্রৈলোক্যর দোকানে। কোথায় ত্রৈলোক্য, কোথায় তাঁর দোকান। কোথাও কিছুর চিহ্ন নেই। লাটুবাবু সেখানেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে গেলেন। আর উঠলেন না।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

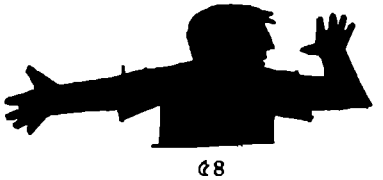

চক্রবৃদ্ধি সুদের সূত্রটা বেমালুম ভুলে গেছে···

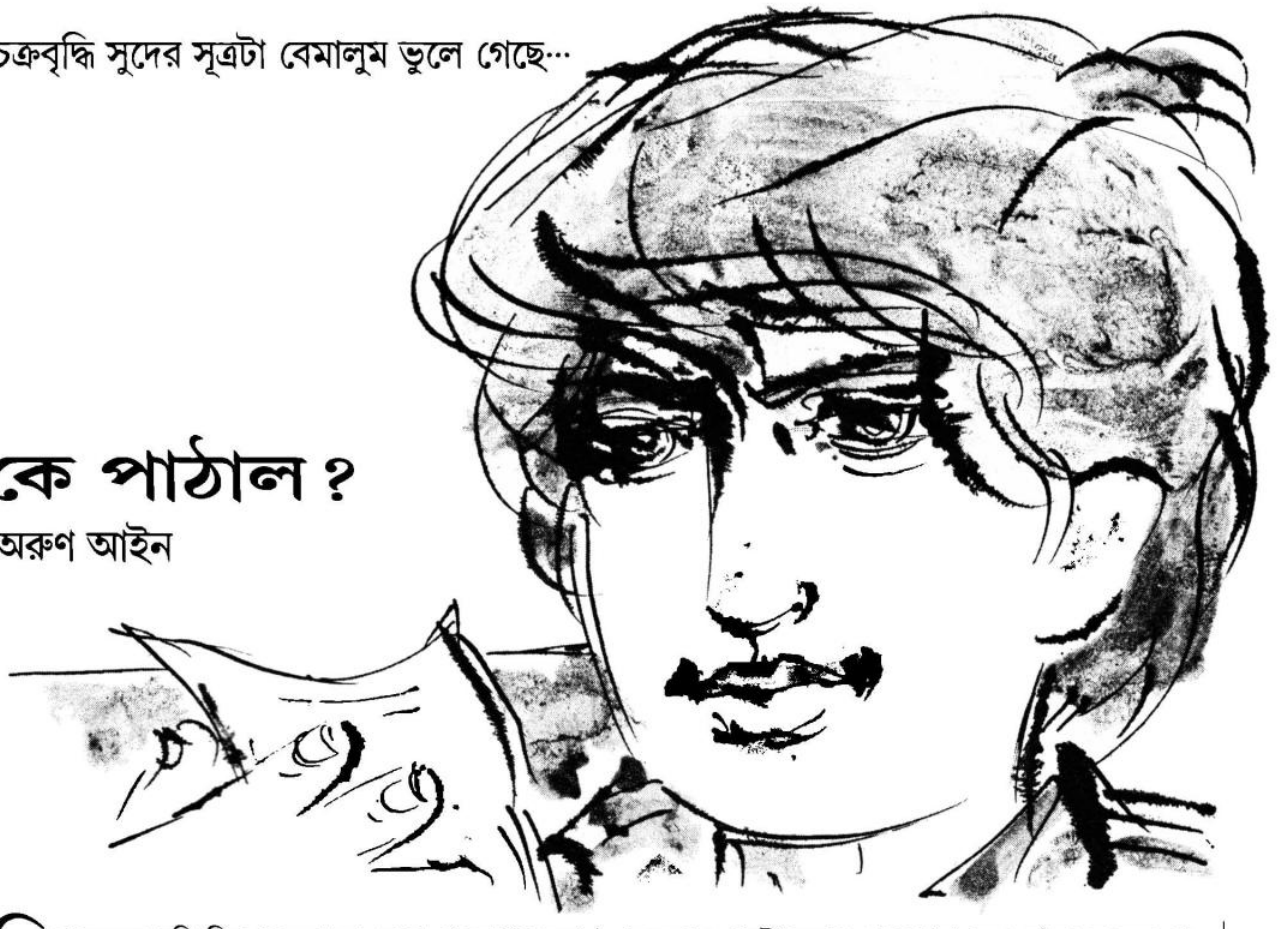

কে পাঠাল ?

অরুণ আইন

বিপু সম্বন্ধে যদি কিছু বলতে হয়, তবে এককথায় বলা যায়, ও ভাল ছেলে। বিপু ক্লাস সেভেনে পড়ে, খুব বন্ধুবৎসল, দারুণ ফুটবল খেলে আর কিছুটা ডানপিটে। লেখাপড়ায় ? হ্যাঁ, তাও মন্দ নয়। কোনও ক্লাসে বিপু আজ পর্যন্ত ফেল করেনি। ভালভাবেই পাশ করে ওঠে প্রতি ক্লাসে। তবে হ্যাঁ, ওই অঙ্কটাই যা একটু গণ্ডগোল। যত উঁচু ক্লাসে উঠছে অঙ্কটা ততই যেন গোলমেলে হয়ে উঠছে। কিছুতেই ব্যাপারটাকে বেচারি বিপু কব্জা করে উঠতে পারছে না। ৩০-৪০ পেয়ে পাশ। এর জন্য বাবার কাছে তার হেনস্থাও কম নয়। হওয়ারই কথা। বিপুর বাবা কলেজে অঙ্কেরই শিক্ষক। তাঁর ছেলে হয়ে,···যাক সে কথা।

ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ভৌতবিজ্ঞান হয়ে গেছে। মোটামুটি ভালই হয়েছে বলা যায়। অবশ্য ভাল হয়েছে বলে লাভই বা কী ? আসল পরীক্ষাটাই তো বাকি। কাল বিপুদের অঙ্ক পরীক্ষা। তিরিশ কেন, বিপুর মনে হচ্ছে এবার তিনও পাবে না। যত সময় এগিয়ে আসছে ততই মাথার ভেতর সব কেমন যেন গুলিয়ে উঠছে।

এখন রাত প্রায় বারোটা। আর দশ ঘণ্টা পর কাল সেই অগ্নিপরীক্ষা। বিপু পড়ার টেবিলে গুম হয়ে বসে আছে। টেবিলল্যাম্পের আলোর তলায় রাজ্যের অঙ্কবই। ওই সব'কটা বইয়ের সব'কটা অঙ্ক তার মুখস্থ। গত তিন মাসে প্রতিটা বইয়ের প্রতিটা অঙ্ক সে অন্তত তিরিশবার করে করেছে। এর বেশি সে আর কী করতে পারে ! তবু বিপু জানে, কাল পরীক্ষার হলে অঙ্কের প্রশ্নপত্র পেয়ে ও নিমেষে সব গুলিয়ে ফেলবে। একটা অঙ্কও ওর জানা অঙ্ক থেকে আসবে না। মাস্টারমশাইরা যে কোথা থেকে অঙ্কগুলো জোগাড় করেন কে জানে ! কোনও বইতে মাস্টারমশাইদের অঙ্কগুলো পাওয়া যায় না।

বাবা বলেন, অঙ্ক নাকি মুখস্থ করার নয়। বোঝার। কিন্তু বিপু ক্লাস ওয়ান থেকে সেভেন অবধি অঙ্ক পরীক্ষার এই বিপুল অভিজ্ঞতা থেকে আসল সত্যটি জেনে ফেলেছে। অঙ্ক আসলে বোঝারও নয়, মুখস্থ করারও নয়। অঙ্ক কপালের। যাদের কপাল ভাল, তারা জানা অঙ্ক থেকে পরীক্ষার অঙ্কগুলো পেয়ে যায়, আর টপাটপ করে দিয়ে লোকের কাছে তারিফ কুড়োয়। বিপুর কপাল খারাপ, ওর জানা অঙ্ক থেকে একটা অঙ্কও পরীক্ষায় আসে না।

বিপুর কপালে এখন বিন্দু-বিন্দু ঘাম। চোখে ঘুম নেই। মা অনেকক্ষণ ধরে বলছেন শুয়ে পড়তে। কিন্তু বিপু শুতে যেতে পারছে না। চক্রবৃদ্ধি সুদের সূত্রটা মনে করতে গিয়ে দেখছে সেটা বেমালুম ভুলে গেছে। বৃত্তের পরিধি আর ক্ষেত্রফলের সূত্র দুটোও একটার সঙ্গে আর-একটা ভয়ানকরকম গুলিয়ে ফেলেছে। জ্যামিতির একটাও সম্পাদ্য আর মনে নেই এখন। বেচারা বিপুর এখন হাল ছেড়ে দেওয়া অবস্থা। অথচ টেবিল ছেড়ে শুতেও যেতে পারছে না। কেননা, বিপু জানে, শুলেও এখন তার চোখে ঘুম আসবে না।

আর ঠিক এই সময় বিদ্যুৎচমকের মতো একবার হাফইয়ার্লি পরীক্ষার কথা মনে পড়ল। এবার হাফইয়ার্লি পরীক্ষায় বিপু অঙ্কে ৯৯ পেয়েছিল। বিপু অঙ্কে ৯৯ পেয়েছে ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও সত্যি। মা বলেন, বিপু

এতদিনে পরিশ্রমের ফল পেল। বাবা বলেন, নির্ঘাত টুকেছে। অঙ্কের মাস্টারমশাই সুনীলস্যার অবাক চোখে চেয়েছেন ওর দিকে। কিন্তু আসল কথাটা কেউ জানে না। কী করে এই অসম্ভব সম্ভব হল তা জানে একমাত্র বিপুর প্রাণের বন্ধু বিল্টু। বিপু একমাত্র বিল্টুকেই জানিয়েছিল আসল রহস্যটা।

বাবা এ-বছর বিপুকে যাদববাবুর একখানা পুরনো অঙ্কের বই কিনে দিয়েছিলেন পুরনো বইয়ের দোকান থেকে। বাবা বলেন, যাদববাবুর বই যে শেষ করতে পারবে তাকে অঙ্কে কেউ কোনওদিন ফেল করাতে পারবে না। আজকালকার সব বই নাকি স্রেফ বাজে। তা সেই যাদববাবুর বই থেকেও বিপু প্রতিটি অঙ্ক কষেছিল হাফইয়ার্লির আগে। হাফইয়ার্লি পরীক্ষার আগের রাত্রেও বিপু ঠিক এমনি বসে ছিল পড়ার টেবিলে। যাদববাবুর বইয়ে কষে দেওয়া অঙ্কগুলোতে একবার শেষবারের মতো চোখ বুলোচ্ছিল। হঠাৎ বইয়ের ভেতর থেকে টুপ করে খসে পড়ে একখানা ভাঁজকরা কাগজ। কাগজটা দেখে বিপু একটু অবাক হয়। আজ মাস-পাঁচেক যাবত সে বইটা ঘাঁটছে। কই কোনওদিন কোনও ভাঁজ-করা কাগজ তো ও এর ভিতরে দেখেনি। একটু অবাক হয়েছিল। কিন্তু তখন অত ভাবারও সময় ছিল না। ভেবে নিয়েছিল হয়তো ছিল, খেয়াল করেনি। কিন্তু ও অবাক হয়েছিল কাগজটা খোলার পরেই। কাগজটার মধ্যে দশটা পাটিগণিত আর চারটে জ্যামিতির প্রশ্ন সল্‌ভ্ করা। অঙ্কগুলোর চেহারা ঠিক পরীক্ষায় আসা প্রশ্নের মতো। তারপর ঘণ্টাদুয়েক সময় বিপু ওই কষে দেওয়া অঙ্কগুলো মুখস্থ করেছে।

কিন্তু অবাক হওয়ার তখনও কিছু বাকি ছিল ওর। পরদিন পরীক্ষার হলে অঙ্কের প্রশ্নপত্র পেতে সেই অবাকটাই হয়েছিল বিপু। হুবহু গতকাল রাতের অঙ্কগুলো। অঙ্কের সেই দশটা এবং জ্যামিতির সেই চারটে প্রশ্ন। টপাটপ অঙ্কগুলো তাই করে ফেলতে পেরেছিল বিপু। আর সেই রহস্য সে শুধু বিল্টুকেই বলেছে। বিল্টু প্রথমটা বিশ্বাস করতে চায়নি। বলেছে, মিথ্যে বলার আর জায়গা পাসনি! কিন্তু বিপুর মুখচোখ দেখে শেষে কিছুটা বিশ্বাসও করতে হয়েছিল তাকে। ও ছাড়া আর কাউকেই এ-কথা বলেনি বিপু। কারণ, বিল্টুই যখন তার এইরকম একটা অসম্ভব গল্প বিশ্বাস করছে না, তখন অন্যেরা তো হেসে উড়িয়ে দেবে। তারপর বিপুও ব্যাপারটা ভুলে গেছে। একটা কাকতালীয় গোছের ব্যাপার ওটা ভেবে নিয়েছিল ও।

কিন্তু আজ এই রাত বারোটায়, অঙ্কের ফাইনাল পরীক্ষার আগের দিন, কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম নিয়ে বিপু এই মুহূর্তে অন্যমনস্কভাবে ভাবছিল, ওইরকম একটা কাকতালীয় গোছের ব্যাপার এবারও ঘটে গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু তারপর বিপু মনে-মনে হাসল। কারণ, ওইরকম একটা কাকতালীয় ব্যাপার ঘটার আর কোনও সম্ভাবনাই নেই। গত কয়েকদিন ও যাদববাবুর বইটা তন্নতন্ন করে ঘেঁটেছে। কোনও ভাঁজ-করা কাগজ দূরে থাকুক, ছোট কোনও চিরকুটও নেই—বিপু দেখেছে।

ঢং করে দেয়াল-ঘড়িতে এই সময় ঘণ্টা পড়তে বিপু চমকে উঠে দ্যাখে সাড়ে বারোটা বাজে, না, আর রাত জেগে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। একটা গোপন নিশ্বাস মোচন করে সে ভাবল, যা হবার তা তো হবেই। পরীক্ষার আগের দিন আর রাত জেগে শুধু-শুধু মাথা গরম করা কেন! এবার শুয়ে পড়া দরকার।

টেবিল ছেড়ে ওঠার আগে ছড়ানো বইগুলো গুছিয়ে রাখছিল ও। আর ঠিক সেই সময় ঘটনাটা ঘটল। সমস্ত বই তোলার পর যখন যাদববাবুর বইটা তাকে তুলে রাখতে যাচ্ছিল ঠিক তখনই বইটার ভেতর থেকে হুবহু আগেরবারের মতো একটা ভাঁজ-করা কাগজ টুপ করে খসে পড়ল। বিপু প্রথমে স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর ওর সারা শরীর শিরশির করে কেঁপে উঠল।

মধ্যরাত্রের সেই নিঃশব্দ চরাচরে ক্লাস সেভেনের বিপু কম্পিত শরীরে কাগজটা তুলল মাটি থেকে। ভিতরে দশটা অঙ্ক আর চারটে জ্যামিতির প্রশ্ন, কষে দেওয়া।

পরীক্ষা শেষ হতেই বিপু গিয়ে ধরল বিল্টুকে। এবার আর বিল্টু উড়িয়ে দিতে পারল না। দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল স্কুলের মাঠে। তারপর বিল্টু বলল, "বইটা ভুতুড়ে বলে মনে হচ্ছে।"

অস্ফুট স্বরে বিপু বলল, "আমারও সেইরকম মনে হয়।"

বিল্টু হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। বলল, "চল তো, বইটা একবার হাতে নিয়ে দেখি।"

বিল্টু বিপুর সঙ্গে ওদের বাড়ি এল। বিপু ওকে তার পড়ার ঘরে নিয়ে এল। তাক থেকে পেড়ে যাদববাবুর বইখানা ওর হাতে দিল। অত্যন্ত নিরীহ-দর্শনের একখানা বই, ভুতুড়ে হওয়ার কোনও চিহ্ন নেই। পুরনো বই যেমন হয়। উপরে আসল মলাটের বদলে দপ্তরির বাড়ি থেকে বাঁধানো। ভিতরের পাতাগুলো হলুদ হয়ে এলেও সব পাতা এখনও অটুট। শুধু শেষের দিকের উত্তরমালার একটা পাতা ছেঁড়া। একটা সাদা পাতায় উত্তরগুলো লিখে সেটা শেষে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

বিল্টু বলল, "দেখে তো কিছু বোঝার উপায় নেই!"

বিপু বলল, "কিচ্ছু না।"

বিল্টু বলল, "কোথা থেকে পেলি বইটা?"

"বাবা কিনে এনেছিলেন কলেজ স্ট্রিটের পুরনো বইয়ের দোকান থেকে।"

"হুঁ!"

বিল্টু বইটা আবার উলটেপালটে দেখতে লাগল। প্রথম পাতায় বিল্টু হঠাৎ থমকে গেল। বলল, "এ আবার কে রে! অমূল্যভূষণ ভট্টাচার্য। ২/১ হরিহর মিস্ত্রি লেন, কলকাতা-৫৬।"

"বোধহয় যার বই ছিল প্রথমে, সে-ই। কেনা থেকেই তো নামটা আছে ওখানে।"

বিল্টু বলল, "চল্, অমূল্য ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করে আসি। ভদ্রলোক বইটা বিক্রি করলেন কেন? উনিও কি এতে কিছু ভৌতিক ব্যাপার লক্ষ করেছিলেন?"

বিপু বলল, "ভাল বলেছিস। ঠিকানা তো আছেই। ওঁর সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে।"

পরদিন সকালে বেলঘরিয়া অঞ্চলে হরিহর মিস্ত্রি লেনে বাড়িটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না দুই বন্ধুর।

কড়া নাড়তে একজন বৃদ্ধ মানুষ বেরিয়ে এলেন। বললেন, "কী চাই?"

বিপু একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল। বিল্টুই বলল, "আজ্ঞে, অমূল্য ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করা যাবে?"

"অমূল্য ভট্টাচার্য!" ভদ্রলোক থমকে গেলেন। তারপর কয়েক মুহূর্তের অস্বস্তি কাটিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কোথা থেকে আসছ?"

"আজ্ঞে, টালিগঞ্জ থেকে।"

"তার সঙ্গে কী দরকার তোমাদের?"

"মানে, ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। যদি দেখা হত; তবে ওঁর সঙ্গে একটা ব্যাপারে কিছু কথা বলতাম।"

ভদ্রলোক বললেন, "এসো, ভেতরে এসো।"

দুই বন্ধুকে তিনি বৈঠকখানায় বসালেন। তারপর বললেন, "কী ব্যাপার বলো তো বাবা? তোমরা অমূল্যকে চিনতে?"

"না।"

"তবে!"

"একটা পুরনো বইয়ে আমরা তাঁর নাম-ঠিকানা পাই। সেই বইটার ব্যাপারে আমরা তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতাম।"

"কী বই?"

"যাদববাবুর পাটিগণিত।"

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, "অঙ্কে ও খুব ভাল ছিল। কোনওদিন একশোর নীচে নম্বর পায়নি। আর কতরকম বই যে ছিল ওর অঙ্কের!"

বিপু মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠল, "ওঁর সঙ্গে একটু দেখা করা যায় না?"

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ বিপুর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর করুণ মুখে হেসে বললেন, "অমূল্য আমার ছেলে। কনিষ্ঠ পুত্র। বছর-দুয়েক আগে কলেজ যাওয়ার সময় রেলে কাটা পড়ে মারা গেছে। ওর বইতে ঘর ভরা ছিল। তার কিছু-কিছু আমি বেচে দিয়েছি পুরনো বইয়ের দোকানে। তারই একটা হয়তো তোমাদের হাতে পড়েছে। কিন্তু ওর সঙ্গে তোমরা কেন দেখা করতে চাইছিলে বললে না তো।"

দুই বন্ধু কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে বসে রইল। তারপর বিল্টু হঠাৎ উঠে পড়ে বলল, "আজ্ঞে, তেমন কিছু না। এমনি কৌতূহল আর কি," বলে বিপুকে হাত ধরে তুলে নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল।

ফেরার পথে শিয়ালদায় নেমে বিল্টু বলল, "চল্, মামার সঙ্গে দেখা করে আসি। পাশেই কোয়ার্টার্স। মামা গয়া প্যাসেঞ্জারের গার্ড।"

মামার সঙ্গে দেখা করে বিল্টু বলল, "মামা, আজ তোমার ডিউটি আছে?"

"হ্যাঁ। কিন্তু কেন রে?" মামা হঠাৎ যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

"গয়া প্যাসেঞ্জারে?"

"আমি তো প্যাসেঞ্জারেরই গার্ড। মেলের আর হতে পারলুম কই!"

বিল্টু বিপুর ঝোলা থেকে যাদববাবুর পুরনো বইটা বের করে বলল, "একটা কাজ কোরো। এই বইটা গয়ার ঘাটে পুড়িয়ে দিও। হেসো না। পুরো গল্পটা শোনো, তারপর হেসো।"

বিল্টু মামাকে গল্পটা শোনাতে বসল।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ছোট্ট পাপু

করুণাময় বসু

ছোট্ট পাপুর মনের কাছে
সব পেয়েছির দেশ ছিল,
সাতরঙা সেই খুশির দেশের
কোথাও কোনও শেষ ছিল?
উড়ো মেঘের ছায়ায় আঁকা
শালুক ফোটা ঝিল ছিল,
ফুড়ুত ফাড়ুত ময়না, শালিখ,
চরকি দেওয়া চিল ছিল।
মেঘ গুড় গুড় বিষ্টি ফোঁটা
পদ্মপাতায় ঝরছিল,
দোলনচাঁপা চমকে দিয়ে
রোদ চিত্তির ভোর ছিল।
আম কাঁঠালের মাথার উপর
মস্ত আকাশ নীল ছিল,
পাপুর মনে সেই আকাশের
কোথায় যেন মিল ছিল।
অবাক চোখে জগৎটাকে
দেখছিল আর চিনছিল,
টুকরো খুশির মুক্তোগাঁথা
ছোট্ট সুখের দিন ছিল।
লাল টুক টুক ফুলের উপর
মৌটুসকির ঝাঁক ছিল,
স্লেটের উপর উপুড় হয়ে
সেই ছবি সে আঁকছিল।

ছবি : দেবাশিস দেব

ধাঁধা

পাইপ থেকে ছাই ঝেড়ে পাইপটা পরিষ্কার করছিল ছোট্কা। আমার হাতে ধাঁধার খাতা, ছোট্কা একবার আড়চোখে সেদিকে দেখে নিল। তারপর মজার মুখ করে বলল, "এসো সতুবাবু। সেই যে একটা কবিতা আছে না, যেখানে দেখিবে ছাই, কুড়াইয়া দেখ তাই... ?" ছোট্কা একটু থতমত খেল যেন, বলল, "কে জানে, কুড়াইয়া না উড়াইয়া, আমারই ছাই মনে পড়ছে না। তবে ছাইয়ের মধ্য থেকে পরশপাথর পাওয়ার ব্যাপার ছিল একটা। তা, এবারের ধাঁধাতেও সেই ছাই খোঁজার ব্যাপার।"

কী যে বলতে চায় ছোট্কা, বিন্দুবিসর্গও মাথায় ঢুকল না আমার। আর তাই দেখেই ছোট্কা আবার হেসে উঠল। বেশ শব্দ-তোলা হাসি। হাসির রেশ তখনও ফুরোয়নি, ছোট্কা বলল, "রবীন্দ্রনাথ মনে পড়ছে না তো কী করা যাবে। আমিই বরং একটা বানিয়ে দিই। ছাই ছাই ছাই/ কত ধাঁধা চাই/ ছাই ঢাকা হয়ে আছে/ পুরো ধাঁধাটাই।" আমি তখনও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। ছোট্কা তখন ভেঙে বলল পুরো ব্যাপারটা।

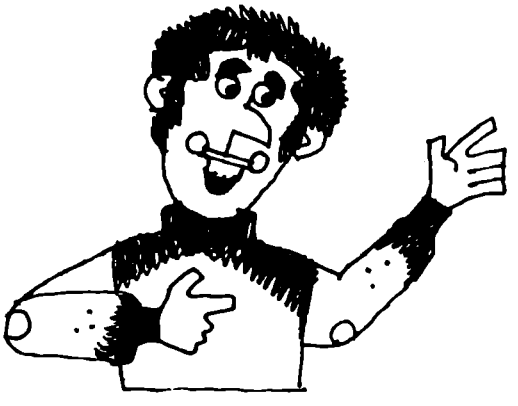

আসলে ছাই তো ইংরেজিতে ash,এবারে কয়েকটা ইংরেজি শব্দ খুঁজে বার করতে হবে, যার মধ্যে ash অক্ষর তিনটে রয়েছে। শব্দগুলো বার করাও খুব কঠিন হবে না, কেননা, মোটামুটিভাবে বাঙলা অর্থ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই অর্থ অনুযায়ী শব্দ খোঁজা।

প্রথম ধাঁধা ॥ নীচের পাঁচটা সূত্র থেকে এমন পাঁচটা ইংরেজি শব্দ বার করো, যে-শব্দগুলোর প্রত্যেকটার মধ্যে ash থাকবে—(ক) লাজুক (খ) আলোর ঝলক (গ) এক ধরনের বাদাম (ঘ) ধোওয়া (ঙ) ভেঙে চুরমার করা।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কী ভুল রয়েছে নীচের উদ্ধৃতিটায় ? ঠিক করে লেখো। "little knowledge is a dangerous thing."

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

নদ্যরোমারু

গতবারের উত্তর ॥ (১) পাঁচখানা দু-টাকার নোট, পঞ্চাশখানা এক টাকার, আটটি পাঁচ টাকার। (২) হুতাশন। বাকিগুলো সূর্যের প্রতিশব্দ। (৩) ঠাকুরদালান।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১	২	৩	■	৪	৫	
■	৬		৭			■
■	■	■		■	■	■
■	৮				৯	■
১০		■		■	১১	১২
১৩		■		■	১৪	
১৫		■		■	১৬	

সংকেত : পাশাপাশি : (১) ফাঁপা মেঠাইবিশেষ। (৪) দ্রুত গমনের জন্য একসময় দস্যুরা যা ব্যবহার করত। (৬) রাজার বাড়ি। (৮) ইংরেজিতে coincidence, বাংলায় কী ? (১০) দেহাংশবিশেষ। (১১) ফুলবিশেষ। (১৩) অনাবৃষ্টি। (১৪) পথ। (১৫) বিখ্যাত ইংরেজ লেখকের সংক্ষিপ্ত নাম। (১৬) বিবিধ।

উপর-নীচ : (২) চোখে আছে, আকাশেও আছে। (৩) সজ্জা। (৪) পৃথিবী। (৫) ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু ইত্যাদিকে কী বলা হয়। (৭) মৃত্যু-কামনায় উপবাসী থেকে বসে থাকা। (৮) বৌদ্ধ মঠ। (৯) ভেট। (১০) আঘাত বা চোট। (১২) ওজর।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

না	ম	তা	■	সা	হ	স
সি	■	স	র	ল	■	প্ত
ক	■	■	ঘু	■	■	র্ষি
■	স	র	ব	রা	হ	■
শ	ক	■	ং	■	ল	ব
ব	র্ম	■	শ	■	ধ	ন্ধ
র	ক	ম	■	ভ	র	ন

রঞ্জন

মজার খেলা

এবারের মজার খেলাটার নাম দেওয়া যেতে পারে দশের দশা। কেন যে এই নাম, তা একটু পরেই জানতে পারবে। তার আগে দশটা পোড়া দেশলাই-কাঠি কিংবা দশটা টুথপিক জোগাড় করে ফেলো।

করেছ ?

বেশ। এবার কাঠি দশটাকে নীচের ছবির মতো সাজাও—

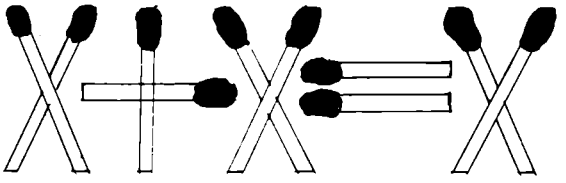

কী দাঁড়াল তা হলে ?

১০+১০=১০। এই তো ?

ধরেছ ঠিক, কিন্তু অঙ্কটা তো ভুল। উত্তর হতে পারত ২০। না হলে, অন্যভাবে সাজিয়ে, ১০ উত্তরে পৌঁছতে হত।

হ্যাঁ, সেই অন্যভাবে সাজানোর কাজটাই করতে হবে। বেশ ঠাণ্ডা মাথায়, দুটো কাঠিকে সরিয়ে, ফের নতুনভাবে বসিয়ে, অঙ্কটাকে একটা ঠিকঠাক চেহারা দিতে হবে। বুঝলে ?

এটা প্রথমে নিজে করো। তারপর বন্ধুদের সামনে সমস্যা হিসেবে তুলে ধরো। কেননা, বন্ধুরা না পারলে তোমাকেই তো করে দেখাতে হবে।

তুমি যদি পেরে যাও, চমৎকার ব্যাপার। আর চেষ্টা করেও যদি উত্তরটা না হয়, তখন ?

তখনকার সেই লজ্জা থেকে বাঁচবার জন্যই নীচে একটা সমাধান করে দেখানো হল—

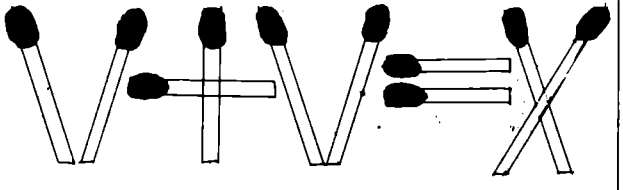

খুবই সহজ সমাধান। তাই না ?

মজারু

হাসিখুশি

"এটা কী এঁকেছ তিতলি ?"

"মাছের ছবি, বাবা।"

"কিন্তু মাছ কই ?"

"মাছ দেখতে পাবে কী করে ? জলের নীচে আছে যে।"

"তোমাদের ক্লাবের নাটক ভাল হয়েছে নিশ্চয়ই ?"

"শেষ হতে সবাই খুশি হয়েছে।"

"দেখুন মিঃ রায়, আমি খবর পেয়েছি আপনি প্রায়ই দেরি করে অফিসে আসেন।"

"কিন্তু স্যার, আপনি এ-খবরটা কি পেয়েছেন যে, আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাই ?"

"নৌকো নিয়ে তো মাছ ধরতে বেরিয়েছ, নদীর যে-জায়গাটায় বেশি মাছ পাওয়া যায় ; সে-জায়গাটা চিনতে পারবে তো ?"

"কেন পারব না ? নৌকোর গায়ে দাগ দিয়ে রেখেছি তো।"

"বলো তো কোন্ প্রশ্নের উত্তরে কখনওই 'হ্যাঁ' বলা যায় না ?"

"জানি না স্যার।"

"এটা তো খুব সোজা প্রশ্ন। তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ ?"

"তোমাকে দেখলেই আমার শুধু বিজনের কথা মনে পড়ে।"

"কিন্তু বিজন আর আমার মধ্যে তো কোনও মিলই নেই !"

"তা নেই, কিন্তু তোমরা দু'জনেই আমাকে একশো টাকা ধার দিয়েছিলে আর সে-টাকা এখনও শোধ দিতে পারিনি।"

ছবি : দেবাশিস দেব

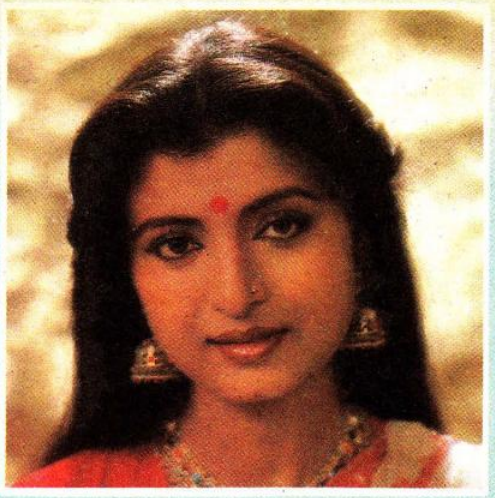

"এখন এমন এক সাবান পেয়েছি, যা দেখি লাক্সের চেয়েও চমৎকার!"– দেবশ্রী রায়

নতুন লাক্স

মনমাতানো নতুন সুবাস

ফুলের মিষ্টি মধুর গন্ধের তাজা সুবাস, যার পঞ্চমুখে প্রশংসা চিত্রতারকাদের নিজের ভাষায়— 'দারুণ,' 'মনোরম' 'অপূর্ব'।

দর্শনীয় নতুন রূপ

আপনার মতনই দর্শনীয় আর আধুনিক আর দারুণ আকর্ষণীয়। তিনটি মনোমুগ্ধ করা রঙে: গোলাপী, সবুজ আর হলদে।

নতুন
লাক্স
চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান।

HLL-2250

হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

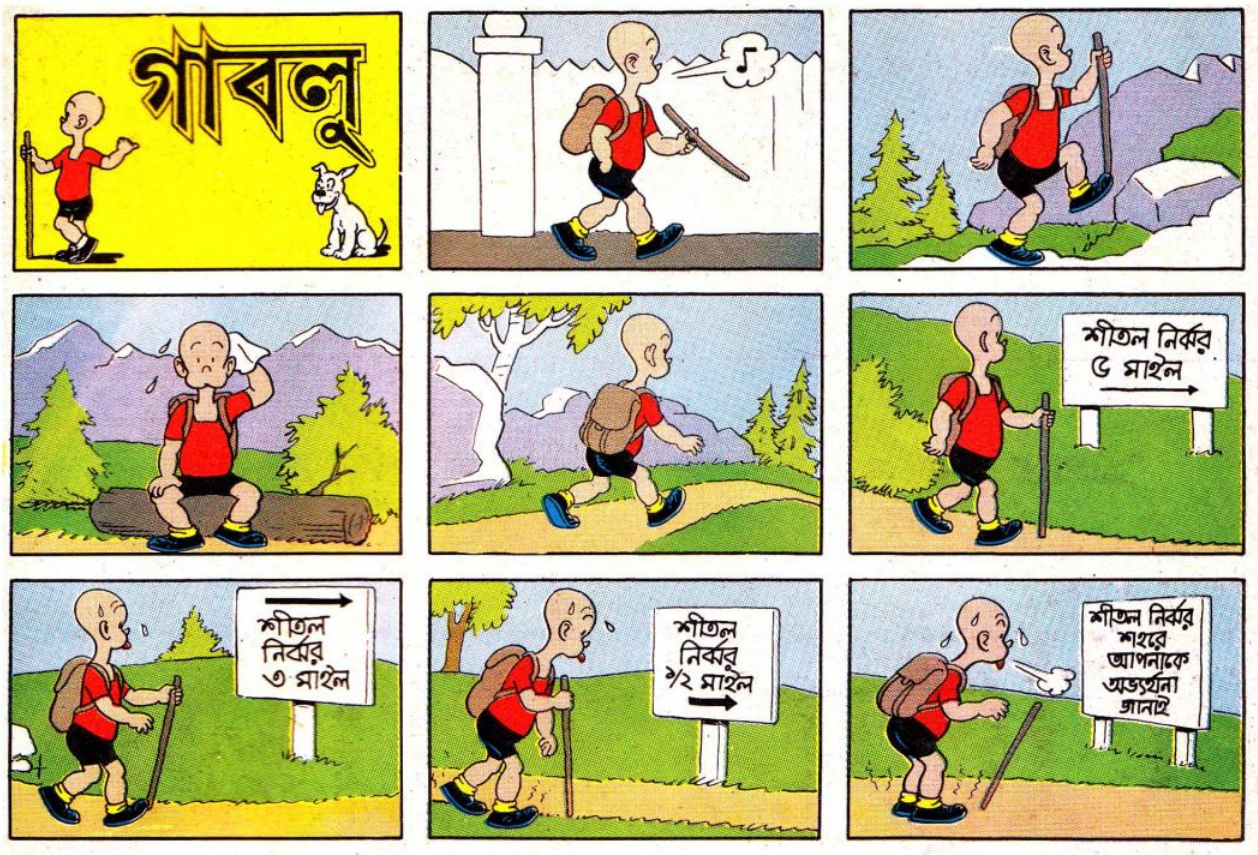
গাবলু
শীতল নির্ঝর
৫ মাইল
শীতল
নির্ঝর
৩ মাইল
শীতল
নির্ঝর
১/২ মাইল
শীতল নির্ঝর
শহরে
আপনাকে
অভ্যর্থনা
জানাই

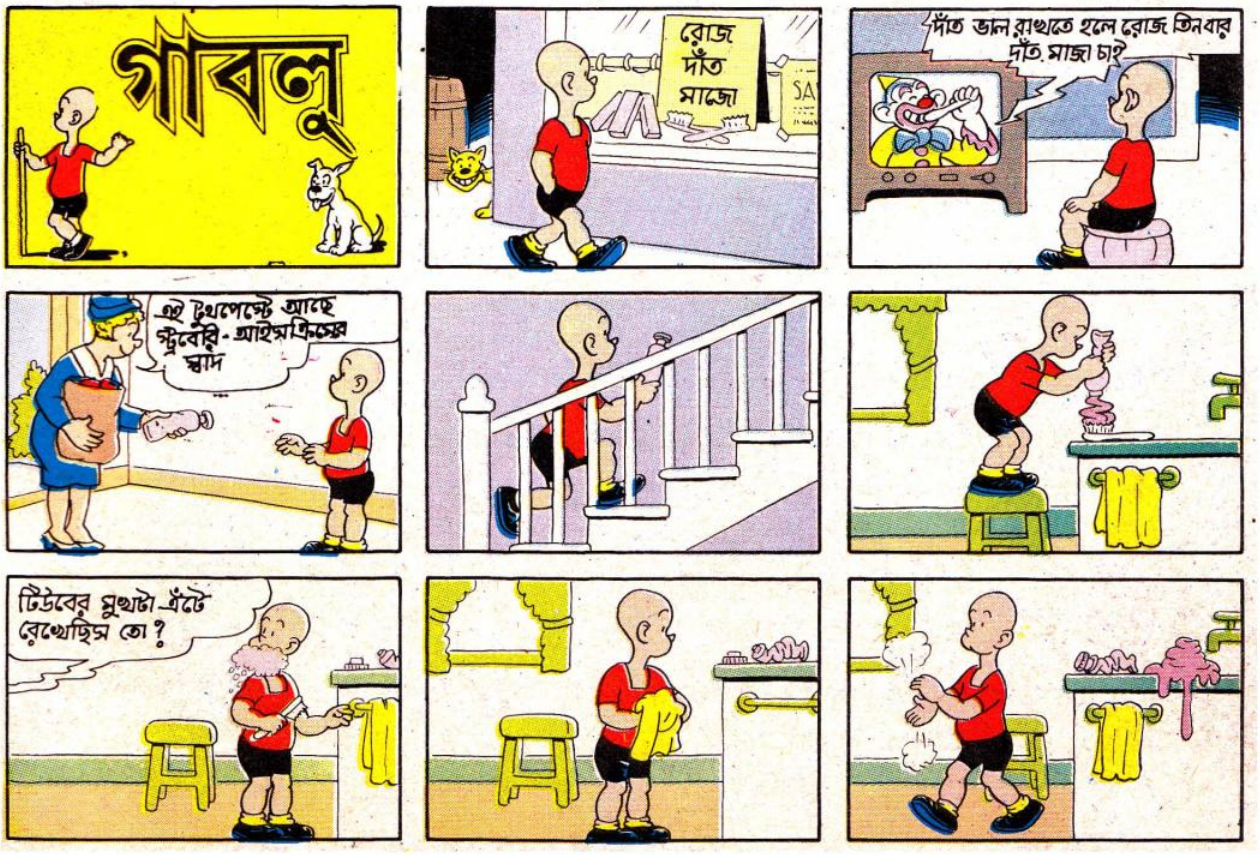
গাবলু
রোজ
দাঁত
মাজো
দাঁত ভাল রাখতে হলে রোজ তিনবার
দাঁত মাজা চাই
এই টুথপেস্টে আছে
স্ট্রবেরি-আইসক্রিমের
স্বাদ
টিউবের মুখটা এঁটে
রেখেছিস তো?

ডাক্তারবাবু বলছেন

বসন্তের ব্যায়াম

এখন ঠাণ্ডা কমে আসছে। গরমও একটু একটু করে বাড়ছে। বসন্তকালের রোগের সঙ্গে গরমকালের রোগের উপদ্রবও আরম্ভ হয় এই সময়ে। পানীয় জলও দূষিত হতে আরম্ভ করে, তাই এই সময় থেকেই পানীয় জলের দিকে নজর দিতে হবে।

মশারি টাঙিয়ে শোবে। দরকার হলে মশারি টাঙিয়ে পাখা খুলে দেবে। যেখানে পাখা নেই, সেখানেও মশারি টাঙিয়ে শোবে। এই সময় থেকে ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের উপদ্রব বাড়ে। আর জানোই তো, মশার কামড়ে এইসব রোগ হয়। মশার কামড় থেকে বাঁচার জন্যে মশারি টাঙিয়ে শোওয়াই ভাল।

আমাদের দেশ গরম আর আর্দ্র দেশ। বসন্তকাল খুব ক্ষণস্থায়ী। দেখতে দেখতে গরম এসে পড়বে, সেইজন্যে এখন থেকে তৈরি না হলে গরমকালের রোগগুলো হয়ে যেতে পারে

ব্যায়ামের অভ্যেস ছাড়বে না। রোজ সকালে ব্যায়াম করবে। ব্যায়ামের সময় একটু একটু করে বাড়াবে। প্রথমে দশ-পনেরো মিনিট, তারপরে সেই অভ্যেস আধঘন্টায় বাড়িয়ে দেবে। যারা সাঁতার কাটো তাদের আর আলাদা ব্যায়াম করতে হবে না। সাঁতারই হচ্ছে পূর্ণ ব্যায়াম, সেইজন্য সাঁতার কাটলে আর অন্য কোনও ব্যায়াম করার দরকার নেই।

তেল মাখার অভ্যেস ছেড়ে দেবে না। ভালভাবে গায়ে পায়ে হাতে তেল মাখবে। মাথাতেও তেল মাখবে। ভাল নারকোল তেল মাখলেই যথেষ্ট। মাথায় তেল মাখবে খুব ঘষে-ঘষে, তাতে চুলের গোড়া শক্ত হয়। চুলের গোড়ার মাংসপেশি শক্ত হলে চুলের গোড়া শক্ত হবে আর চুল পড়বে না। অনেকেই চুল পড়ে যাবার জন্য খুব চিন্তা করে, কিন্তু কিছু চুল তো পড়বেই। পুরনো চুল পড়ে গিয়ে সেই জায়গায় নতুন চুল গজিয়ে ওঠে। এটা শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম, এটা কোনও রোগ নয়।

(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায়

জেনে নাও

মাথা ধরে কেন

মাথা ধরে অনেক সময়ে। কিন্তু কেন ?

মাথা ধরা এক রকমের আরোপিত যন্ত্রণা। একটা কথা আছে না, 'অল রোড্‌স লিড টু রোম'। সেইরকম শরীরের নানা জায়গার অনেক অস্বাভাবিকতার শেষ ফল শেষ পর্যন্ত মাথা ধরা। মাথা ধরাকে তাই বলা হয় আরোপিত যন্ত্রণা, অর্থাৎ যা আরোপ করা হয়েছে। এর বেশির ভাগ করোটির অন্তর্দেশ থেকে আর কিছুটা করোটির বাইরের কোনও উৎস থেকে মস্তকের উপরিতলে আরোপিত হয়।

মাথা ধরার অনেক কারণ আছে। প্রধান প্রধান কারণগুলি হল, মস্তিষ্ক-ঝিল্লির প্রদাহ বা ক্ষত, মস্তিষ্ক মেরুরসের চাপ হ্রাস, রক্তচাপ বৃদ্ধি, চোখের গোলযোগ, নাক বা ওই অঞ্চলের প্রদাহ আর আবেগ উদ্বেগ প্রভৃতির জন্যে মস্তক ও গ্রীবা পেশির আক্ষেপ।

ছবি : পরমেশ পুরকায়স্থ

জীবজন্তুর গায়ে রোম বেশি কেন

স্তন্যপায়ী সকল প্রাণীর দেহেই কম-বেশি রোম থাকে। কেন ? স্তন্যপায়ী প্রাণীর শরীরে বেশি রোম থাকার কারণ কী ?

স্তন্যপায়ী প্রাণীরা উষ্ণশোণিত। এদের রক্ত গরম। তাই এদের দেহের তাপ চারপাশের পরিবেশ থেকে বেশি। এইজন্যে সব সময়েই দেহ থেকে তাপ বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু দেহে রোম বেশি থাকায় এই তাপ বেরিয়ে যাওয়ার পথে বাধা পড়ে।

কেমন করে ?

দেহের রোম তাপের কুপরিবাহী। ফলে তাপ বেরোতে বাধা দেয়। তা ছাড়া দেহে রোমের ফাঁকে-ফাঁকে বাতাস আটকে থাকে। বাতাসও তাপের কুপরিবাহী। ফলে কুপরিবাহিতা আরও বেড়ে যায়।

তাই গায়ে বেশি রোম স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখার একটা কৌশল যেন। এতে তাপক্ষয় হ্রাস পায়। আর দেহ থেকে এই তাপের ক্ষয় কমানোর জন্যেই জীবজন্তুর শরীরে বেশি রোম থাকে।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

হকিতে ভারতে ভারতই জিতল

সুজয় সোম

হকির পৃথিবীতে ভারত-পাকিস্তানের রেষারেষি কলকাতার ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের মর্যাদার লড়াইয়ের মতো। স্নায়ুযুদ্ধ। উনিশশো ছিয়াশির সাত টেস্টের সিরিজের তিনটে খেলা হল ভারতের মাটিতে। এই

ভারতের অধিনায়ক মহম্মদ শাহিদ

তিনটির মধ্যে প্রথমটি জিতল পাকিস্তান। তারপর পরপর দুটি জিতল ভারত।

প্রথম টেস্ট ঘিরে কলকাতা উত্তেজনার চুড়োয় উঠে বসে ছিল। ভারতের ব্যালান্সড টিম। পাকিস্তান দলে একঝাঁক তরুণ, আনকোরা খেলোয়াড়। পনেরোই ফেব্রুয়ারি বিকেলে মোহনবাগান মাঠের মখমলের গালিচায় ফেভারিট দল ভারত ২-৩ গোলে হেরে গেল।

সব খেলাতেই প্রথম পনেরো-কুড়ি মিনিট একটা ওয়ার্ম-আপ ফেজ থাকে। ওই সময়টুকুতেই রাইট-ইন সেলিম শেরওয়ানির উশকানি, পাকিস্তানিরা গুছিয়ে নিলেন। সেলিমের স্পিড ও স্টিকওয়ার্কের নিখুঁত কম্বিনেশন দেখার মতো! ম্যাচের চতুর্থ মিনিটে কশিম জিয়ার শর্ট কর্নার থেকে দারুণ স্কুপ করে ফরহাত খাঁ গোল তুলে নিলেন। দশ মিনিট বাদে গোল শোধ করলেন মহিন্দর পাল সিং। তুমুল কর্নার হিট। প্ল্যানমাফিক স্কিলড হকি খেলে বিরতির বাঁশি বাজার আগেই ৩-১ গোলে এগিয়ে গেলেন হাসান সর্দার অ্যাণ্ড কোং। শর্ট কর্নার থেকে পর পর দুটো গাল। কশিম, ওয়াসিম ফিরোজ। আক্রমণের চাপে ভারতের ডিপ ডিফেন্স তছনছ। ভারতীয় মিডফিল্ডের বাঁদিকের ফলা পাকিস্তানের রাইট উইংয়ের ডানা ঝাপটানো সামলাতে পারল না।

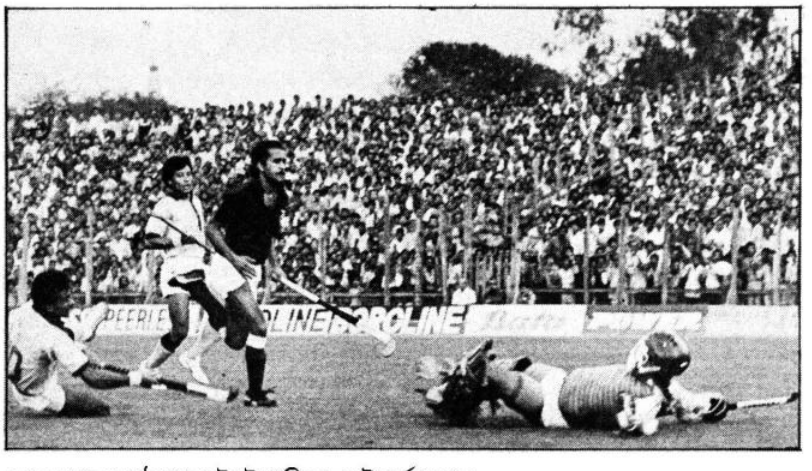

মোহনবাগান-মাঠে প্রথম টেস্টে শাহিদের সেই দুর্দান্ত গোল

একটি টুথব্রাশ কিক'রে বিশেষ বলে গণ্য হয়?

বেশীর ভাগ লোকেই
ঐ বিষয়ে একেবারেই
ভাবেন না—শুধু, যাঁরা
ফরহ্যান্স ব্যবহার করেন
তাঁরা ছাড়া!

সব টুথব্রাশই সমানভাবে তৈরী করা হয় না—

ফরহ্যান্স টুথব্রাশ অন্যগুলির চেয়ে সেরা।

এর ডবল অ্যাকশন, একাধারে দাঁতও সাফ করে আবার মাড়িও মালিশ করে।

আপনি আপনার টুথপেস্ট বেছে নেন, খুবই যত্নভরে তাই না? তাহলে আপনার টুথব্রাশও ফরহ্যান্স-ই হওয়া উচিত কিনা বলুন!

ফরহ্যান্স

ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ

অ্যাডাল্ট, জুনিয়ার ও
অ্যাঙ্গুলার ডিলাক্স

408-GM-241-BEN

প্রথম টেস্টে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গোল করছেন কশিম জিয়া

পাকিস্তানের আবদুল রশিদ এগোচ্ছেন, পাশেই ভারতের হরদীপ সিং

অশোককুমার খামোখা অতটা জায়গা ছাড়লেন কেন সেলিমকে ?

দ্বিতীয় পর্বে পঁয়ত্রিশ মিনিট দাপট দেখাল ভারত। সেন্টার লাইনে জোয়াকিম কার্ভালহোর কাছ থেকে বল ধরেই চোখের নিমেষে চার ডিফেণ্ডারকে চিরে, গোলকিপারকে টলিয়ে দিয়ে চলতি বলে স্ট্রোক করলেন ভারত-অধিনায়ক মহম্মদ শাহিদ। দিনের সেরা গোল। সূক্ষ্ম শিল্পের ছোঁয়া আর কাকে বলে ? হেরে যাবার দুঃখ ঘুচে গেল।

বৃষ্টিভেজা কোলাপুরের শিবাজি স্টেডিয়ামের এবড়ো-খেবড়ো মাঠে দ্বিতীয় টেস্ট। দাঁতে দাঁত চাপা, টানটান লড়াই দেখতে পেলুম না। ভারতীয়দের চমৎকার বোঝাপড়া, তীব্র গতির সামনে পাকিস্তানিরা ভ্যাবাচ্যাকা, নাজেহাল ! যদিও নয় মিনিটে ফুল ব্যাক মহিন্দর ভারতকে এগিয়ে দেবার পরের মুহূর্তেই গোল শোধ করলেন কশিম। দুটে গোলই জোরালো পেনাল্টি কর্নার থেকে। ভারতের ছকে-বাঁধা আক্রমণ দানা বাঁধছিল দলপতিকে ঘিরে। মিডফিল্ডাররা জমিয়ে খেললেও, স্ট্রাইকারের অভাবটা এদিনও বড্ড চোখে লাগল। পাকিস্তানের সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র খোদ ক্যাপ্টেনসায়েবকে ট্যাঁ-ফোঁ করতে দিলেন না কার্ভালহো। সারাক্ষণ আগলে রাখলেন। সেলিমকে দল সামলাতে হল। তাঁর সূক্ষ্ম স্টিকওয়ার্ক, তুমুল গতির খেলা দেখে দর্শকেরা বেজায় খুশি, দলের কোনও লাভ হল না। মোটে সাহায্য পেলেন না অন্য ফরোয়ার্ডদের কাছ থেকে !

খেলা শেষ হবার বারো মিনিট আগে একটা হাফ-চান্স থেকে লেফ্‌ট উইঙ্গার থৈবা সিং ভারতকে মধুর জয় উপহার দিলেন। শনিবারের হারের বদলা মঙ্গলবারে। পঁচিশ গজ দূর থেকে স্কুপ করেছিলেন কার্ভালহো। গোলকিপার মৈনুদ্দিনের ঠিক সামনে। ডিফেণ্ডাররা বা মৈনুদ্দিন বাউন্স বুঝে বলের দখল নেবার আগেই পড়িমরি ছুটে স্টিক ছুঁইয়ে দিলেন থৈবা।

একুশে ফেব্রুয়ারি হায়দরাবাদের টেস্টে ভারতীয়রা দিলেন পাঁচটা ফিল্ড গোল, পাকিস্তান একটা। গোটা খেলাটায় রাজত্ব চালিয়ে শাহিদের দলবল ৬-৩ গোলে জিতে গেলেন। শাহিদের স্টিক থেকে দুটো গোল। একবার দুই ডিফেণ্ডার ও গোলকিপারকে কাটিয়ে দুর্দান্ত রিভার্স ফ্লিক, আরেকবার টিক্কেনের সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করে 'ডি'র মাথায় পৌঁছে জোরালো শট। হরদীপ, থৈবা এবং টিক্কেন সিং একটা করে গোল তুলে নিলেন। পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল দিলেন কার্ভালহো। পাকিস্তানের আয়াজ মেহমুদের গোলটাও পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে। বাকি গোল দুটোও ফরহাত খাঁর নিজের চেষ্টাতে চারজন ডিফেণ্ডারকে ড্রিবলে হারিয়ে। ভারতীয় ডিপ ডিফেন্সে পারগত সিং দারুণ খেললেন। পাক-ফরোয়ার্ডদের রুখে দিলেন বারে বারে, মাথা ঘামিয়ে ভারতীয় ফরোয়ার্ডদের অ্যাটাকিং করে তুললেন। সেই অ্যাটাক মিডফিল্ডে ব্লক করতে গিয়ে পাকিস্তানি হাফ লাইন আতান্তরে পড়ে যায়। ফোটো : সন্তোষ ঘোষ

জুনিয়র টেবল টেনিসে বাংলার সাফল্য

মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য

কিছুদিন আগে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে জাতীয় সাব জুনিয়র এবং জুনিয়র টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এবারের এই প্রতিযোগিতায় অনেকদিন বাদে বাংলা বেশ ভাল ফল করেছে। ৪ ফেব্রুয়ারি এই প্রতিযোগিতা দিল্লিতে শুরু হয়।

এবারে প্রতিযোগিতায় ছেলেদের দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়ে সোনা জেতে বাংলা দীর্ঘদিন বাদে। তারা 'সি' গ্রুপে শীর্ষস্থান দখল করে গ্রুপ রানার্স পাঞ্জাব সহ চারটি দলকে ৩—০ ব্যবধানে হারিয়ে। আরেক রাজ্য মধ্যপ্রদেশকে বাংলা গ্রুপের খেলায় হারায় ৩—১ ব্যবধানে। কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলার ছেলেরা হারায় ৩—১ ব্যবধানে মহারাষ্ট্র 'এ'-কে, এর পরে তারা সেমিফাইনালে দিল্লিকে হারায় ৩—০ ব্যবধানে। ফাইনালেও বাংলা উত্তর প্রদেশকে হারায় ৩—১ ব্যবধানে। এবারের প্রতিযোগিতায় রানার্স হয় উত্তরপ্রদেশ এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে রাজস্থান।

মেয়েদের দলগত বিভাগেও বাংলা 'সি' গ্রুপ থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে যায় গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা মহারাষ্ট্র 'বি'-কে হারিয়ে সেমিফাইনালে যায় এবং সেমিফাইনালে মধ্যপ্রদেশের কাছে ০—৩ ব্যবধানে হারে।

এই দলগত বিভাগের ফাইনালে ওঠে মধ্যপ্রদেশ ও আসাম, বিজয়ী হয় মধ্যপ্রদেশ। এই বিভাগে মধ্যপ্রদেশ প্রথম স্থান, আসাম দ্বিতীয় স্থান, এবং বাংলা অধিকার করে তৃতীয় স্থান।

সাব-জুনিয়র বিভাগে ছেলেদের দলগত খেলায় প্রথম স্থান পঞ্জাব, দ্বিতীয় স্থান বাংলা ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে আসাম। সেমিফাইনালে বাংলার ছেলেরা অনায়াসে উত্তর প্রদেশকে ৩—০ ব্যবধানে হারালেও অন্য একটি সেমিফাইনালে আসামকে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে পরাজিত করার পর পঞ্জাব ফাইনালেও বাংলাকে হারিয়ে দেয় ৩—১ ব্যবধানে।

সাব-জুনিয়র বিভাগে বাংলার মেয়েরা 'এ' গ্রুপ থেকে শীর্ষস্থান পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের বাধা টপকিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে। কিন্তু সেমিফাইনালে কেরল অঘটন ঘটায় গতবারের চ্যাম্পিয়ান বাংলাকে ৩—১-এ হারিয়ে। অপর সেমিফাইনালে দারুণ লড়াইয়ের পর পঞ্জাবকে পরাজিত করে ফাইনালে যায় মধ্যপ্রদেশ এবং কেরলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। এই দলগত বিভাগে বাংলার মেয়েরা তেমন খেলতে পারেনি। পঞ্জাব পায় তৃতীয় ও বাংলা চতুর্থ স্থান।

এবারে বাংলা জাতীয় জুনিয়র ও সাব-জুনিয়র টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় দলগত বিভাগে ভাল ফল করলেও ব্যক্তিগত বিভাগে আরও ভাল ফল করেছে। বাংলার ছেলেরা এবারের প্রতিযোগিতায় মোট ৮টি পদক জিতেছে। তার মধ্যে ছেলেরা দলগত বিভাগে সোনা, মেয়েরা দলগত বিভাগে ব্রোঞ্জ এবং সাব-জুনিয়র বিভাগে ছেলেরা রুপো পেয়েছে। আরও তিনটি সোনা জিতেছে বাংলা, ছেলেদের সিঙ্গলসে, ডাবলসে এবং মেয়েদের ডাবলসে। ছেলেদের সিঙ্গলসে বাংলার নুপুর সাঁতরা জেতে বাংলার গণেশ কুণ্ডুকে পরাজিত করে। নুপুর এবারের ফাইনালে জিতে বাংলাকে অনেকদিন বাদে এক দুর্লভ সম্মানের অধিকারী করল। দীর্ঘদিন বাদে বাংলা আবার ছেলেদের ব্যক্তিগত সিঙ্গলসে জয়ী হল। সেই ১৯৫৭ সালে কলম্বোয় জিতেছিল দীপক ঘোষ। দীর্ঘ ২৭ বছর পর আবার নুপুর সাঁতরা জিতল।

আপনার টুথব্রাশ আপনি কি ক'রে বাছবেন?

বেশীর ভাগ লোকই ও বিষয়ে মোটেই চিন্তা করেন না— শুধু, যাঁরা ফরহ্যান্স ব্যবহার করেন তাঁরা ছাড়া!

সব টুথব্রাশই সমানভাবে তৈরী করা হয় না—

ফরহ্যান্স টুথব্রাশ অন্যগুলির চেয়ে সেরা।

এর ডবল অ্যাকশন, একাধারে দাঁতও সাফ করে আবার মাড়িও মালিশ করে।

আপনি আপনার টুথপেস্ট বেছে নেন খুবই যত্নভরে তাই না? তাহলে আপনার টুথব্রাশও ফরহ্যান্স-ই হওয়া উচিত কিনা বলুন!

ফরহ্যান্স

ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ

অ্যাডাল্ট, জুনিয়ার ও অ্যাডুলার ডিলাক্স

410-GM-241-BEN

ক্রিকেটারদের গল্প

সম্রাট রায়

অস্ট্রেলিয়াতে বিশ্ব একাদশ দলে ছিলেন ইন্তিখাব আলম এবং বব কিউনিস। দু'জনের চেহারাই ছিল একটু বেশিরকম গোলগাপ্পা। ভারতের উইকেটকিপার ফারুক ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন খুব মজার লোক। ফারুক সবসময় ওঁদের দুজনের পেছনে লাগতেন, আর রাগাতেন 'মোটা' বলে। ইন্তিখাব এবং কিউনিস দুজনেই জবাবে বলতেন,

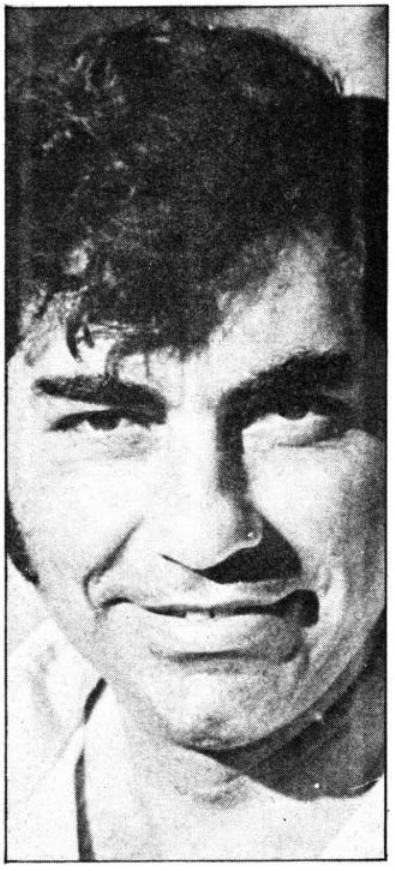

ফারুক ইঞ্জিনিয়ার (দৌড়ে লাস্ট)

"চলো, একশো মিটার দৌড়ে আসি, দেখা যাক কে জেতে!"

ফারুক রোজই এড়িয়ে যেতেন। একদিন ওঁরা একরকম জোর করে ফারুককে মাঠে নিয়ে গেলেন। ম্যানেজার বিল জেকবস হলেন স্টার্টার এবং টনি গ্রেগ ও নর্ম্যান গিফোর্ড দাঁড়ালেন বিচারক হিসেবে। দৌড় শুরু হল। এবং সকলকে অবাক করে সত্যি সত্যিই লাস্ট হলেন ফারুকই।

ইংল্যান্ডের ছ' ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি লম্বা ক্রিকেটার টনি গ্রেগ এবং হিল্টন একারম্যান, দুজনেই তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় কারি কাপে খেলছেন। হঠাৎ খবর গেল, 'তাড়াতাড়ি চলে এসো, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্ব একাদশে তোমরা মনোনীত হয়েছ।' বিশ্ব একাদশে সুযোগ পাওয়া বিরাট ব্যাপার। 'আমরা যাচ্ছি, এয়ারপোর্টে লোক রেখো'— ছোট্ট মেসেজ পাঠিয়ে দু'জনেই তড়িঘড়ি রাতের প্লেনে উঠে পড়লেন। অ্যাডিলেড এয়ারপোর্টে প্লেন এসে পৌঁছল ভোরের দিকে। আর সেখানেই ঘটল মজার ঘটনা। প্লেন থেকে নেমে গ্রেগ এবং একারম্যান চারদিকে তাকাচ্ছেন, এমন সময় দেখা গেল গ্যারি সোবার্স এবং একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন ওঁদের কাছে।

"যাক, রিসিভ করার জন্য লোক এসেছে তা হলে।" চুপিচুপি গ্রেগকে উদ্দেশ করে একারম্যান বললেন।

সোবার্স তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোকের পরিচয় দিয়ে বিড়বিড় করে কী বললেন, সেটা একারম্যানের কানেই গেল না। তা ছাড়া ভদ্রলোকের পরিচয় জানার ব্যাপারে একারম্যানের আগ্রহও খুব একটা ছিল না। ঘুমজড়ানো গলায় শুধু সৌজন্যমূলক 'হ্যালো' বলে দু'জনেই কফির কাপে চুমুক দিতে শুরু করলেন। কফি শেষ হল, এবার হোটেলে যেতে হবে। হাতের ব্যাগটা ভদ্রলোককে ধরতে বলে চোখে-মুখে জল দিয়ে একটু তাজা হয়ে নেবার জন্যে একারম্যান টয়লেটে গেলেন। ওখান থেকে ফিরে আসার পরে তাঁর মনে হল, ইশ, ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা কথা পর্যন্ত বলা হয়নি। স্বর নরম করে একারম্যান জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত?" ভদ্রলোক অল্প মাথা নেড়ে জানালেন, "হ্যাঁ।"

"আপনি কি নিজে ক্রিকেট-ট্রিকেট খেলেছেন?"

এবারও ভদ্রলোক কথা না বলে মাথা নাড়লেন একদিকে। গলায় একরাশ বিস্ময় ফুটিয়ে একারম্যান জিজ্ঞেস করলেন, "তাই নাকি, তা নাম কী আপনার?"

ভরাট গলায় ভদ্রলোক বললেন, "ডন ব্রাডম্যান।"

ডন ব্রাডম্যানের হাত থেকে সেরা ব্যাটসম্যানের উপঢৌকন নিলেন তাঁরই উত্তরসূরী সুনীল গাওস্কর

“আপনি কি আপনার স্ত্রীকে সত্যিই ভালবাসেন? দাড়ান! দাড়ান! ভুল বুঝবেন না। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ব্যাপারটা হচ্ছে প্রেসার কুকার নিয়ে আর সেটা আপনার স্ত্রীর-ই সুরক্ষার জন্যে। যদি আপনার স্ত্রীকে অল্প ভালবাসেন, তাহলে যে কোন প্রেসার কুকার কিনে দিতে পারেন। যদি তার থেকে একটু বেশীই ভালবাসেন তাহলে আরও ভাল প্রেসার কুকার কিনে দিন। কিন্তু যদি আপনার প্রাণের থেকেও তিনি প্রিয় হন, তাহলে নিশ্চই প্রেস্টীজ প্রেসার কুকার কিনে দিতে হবে।

100% SAFE

এখন জিজ্ঞেস করতে পারেন প্রেস্টীজই বা কেন?

এইজন্য যে গাস্কেট রিলীজ সিস্টেম নতুন প্রেস্টীজকে ১০০% নিরাপদ করেছে। এই অভিনব গাঃ রিঃ সিঃ কিভাবে কাজ করে দেখুন।

যদি খাবার জমে ওয়েট-ভালভের মুখ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সাধারণ প্রেসার কুকারে স্বাভাবিকের বেশী প্রেসার তৈরী হয়ে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করে। কিন্তু নতুন প্রেস্টীজে যদি সেফটি-ভাল্ভ ও অকেজো হয়ে যায়, তাহলেও ভেতরের অতিরিক্ত ভাঁপ গাঃ রিঃ সিঃ দ্বারা বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে। সুতরাং আপনি সম্পুণ সুরক্ষিত। সেজন্য নতুন প্রেস্টীজকে নিয়ে কোন রকম বিপদের সম্ভাবনা নেই।”

যদি বৌকে সত্যিই ভালবাস
তাহলে প্রেস্টীজই নিয়ে এস

প্রেস্টীজ

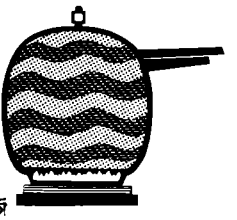

Prestige 25 SILVER JUBILEE 1984-85

ttk উৎপাদন

শুধুমাত্র প্রেস্টীজই ১00% নিরাপদ। একমাত্র প্রেস্টীজেই আছে গাঃরিঃসিঃ।

MAA (S) TTP 3D BEN 85

Anandamela 19 March 1986. Regd. No. WB/CC/264. MH By-South. 683TN/MS(c)/731